আমাদের জীবনে পাখি

ডঃ সুধীন সেনগুপ্ত



পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

বিজ্ঞান পুস্তিকা

আমাদের জীবনে পাখি

ডঃ সুধীন সেনগুপ্ত

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

AMADER JIBONE PAKHI
(Birds in our life)
Dr. Sudhin Sengupta

প্রকাশকাল—সেপ্টেম্বর, ১৯৮৫

প্রকাশক :
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)
আর্য ম্যানসন (নবমতল)
৬এ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার
কলকাতা-৭০০০১৩

মুদ্রাকর :
শ্রীসুধাতোষ বসু
ইম্প্রেশন
৩৩বি, মদন মিত্র লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

চিত্রাঙ্কন : শ্রীমতি শ্রীলতা সেনগুপ্ত, মনজ সেনগুপ্ত এবং সুব্রত দাস।
আলোকচিত্র : দীপঙ্কর সান্যাল, শ্রীএস. এম. আলী,
শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং এবং ডঃ অর্চনা রায়ের সৌজন্যে
প্রচ্ছদ : বিমল দাস, দুর্গা রায়

মূল্য : চৌদ্দ টাকা

Published by Professor Ladlimohan Roychoudhury, Chief Executive Officer, West Bengal State Book Board under the centrally sponsored scheme of production of books and literature in regional language at the University level, launched by the Government of India, the Ministry of Education and Social Welfare (Department of Culture), New Delhi.

শ্রীলতাকে

যে আমার কঠিনতম জীবন সংগ্রামের

নির্ভিক সহেলী।

মুখবন্ধ

১৯৮০ সালে বসন্তের এক উজ্জ্বল অপরাহ্নে রেড রোডের প্রান্ত সীমায় সারবদ্ধ কৃষ্ণচূড়া গাছের রক্তবর্ণ ফুলের মাঝে এক ঝাঁক পাখির বিচিত্র কর্মকাণ্ড দেখেছিলাম। ঐ মন মাতানো দৃশ্য দেখে Birds in our life নামে একটা ছোট প্রবন্ধ Science Reporter-এ প্রকাশ করি। পরবর্তীকালে কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজের অধ্যাপক ডঃ তারক মোহন দাস মহাশয়ের অনুপ্রেরণাতে 'আমাদের জীবনে পাখি' লেখা সম্ভব হয়। তার এই সহৃদয়তার জন্য আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ।

ভারতবর্ষে যত প্রজাতির পাখি আছে তার খুব অল্প সংখ্যকের বিজ্ঞানসম্মত ও সর্বজনগ্রাহ্য বাংলা বা অন্য কোনো ভারতীয় ভাষায় নাম পাওয়া যায়। এমন কি একই পাখি বহু নামে একই জেলার বিভিন্ন স্থানে ব্যবহৃত হয়। নাম-করণে সঙ্কট বাঁচাতে তাই আমি পাখির ইংরেজী নাম ব্যবহার করেছি। কিন্তু যে সব পাখির বাংলা নাম কিছুটা ব্যাপ্তিলাভ করেছে, তা আমি গ্রহণ করেছি। আর পরিশিষ্টে ইংরেজী ও বৈজ্ঞানিক উভয় নাম দিয়েছি।

ঐ বইটির রূপদানে আমাকে অনেকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। বিশিষ্ট সাহিত্য সমালোচক শ্রীচণ্ডীদাস চ্যাটার্জীর আনুকূল্যে আমি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর লেখা থেকে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছি। কলিকাতা সেণ্টপলস ক্যাথিড্রাল চার্চের রেভারেণ্ড আই. ইমেলম্যান বাইবেলে বর্ণিত পাখির অনেক তথ্য আমাকে উপহার দিয়েছেন। জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার প্রাণী সংরক্ষণ বিভাগের প্রধান শ্রী এস. এম. আলি কোরাণে বর্ণিত পাখির কিছু বিচিত্র তথ্য আমাকে দিয়েছেন। ঐ বিভাগের শ্রীত্রিদিব মিত্রের কাছ থেকেও অনেক সাহায্য পেয়েছি। আনন্দবাজার পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক শ্রীনিখিল সরকার ও পক্ষিতত্ত্ববিদ শ্রীঅজয় হোম পাণ্ডুলিপি পড়ে তার যথাযথ সংশোধন করেছেন। বিড়লা একাডেমি অফ আর্টস ও কালচারের কিউরেটর ডঃ অর্চনা রায় এর সাহায্যে চারুকলা ও বয়ন শিল্প থেকে পাখির অনেক অজানা তথ্য সংগ্রহ করেছি। আমার স্ত্রী শ্রীলতা পাণ্ডুলিপির রূপবিন্যাসে

নানাভাবে সাহায্য করেছেন। এঁদের সকলের কাছে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞ।

জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার প্রধান ডঃ বিনয় কুমার টিকাদার আমার কাজের জন্য ল্যাবরেটরি ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। এর জন্য আমি তার কাছেও বিশেষ কৃতজ্ঞ।

জন্মাষ্টমী, ১৩৯০
কলকাতা

সুধীন সেনগুপ্ত

ভূমিকা

পাখির অপূর্ব বর্ণসুষমা, মাধুর্যময় কণ্ঠস্বর, প্রাণবন্ত চাঞ্চল্য মানুষকে যেভাবে উদ্বেলিত ও অনুপ্রাণিত করেছে তা অন্য কোনো প্রাণীর পক্ষে সম্ভব হয় নি। তাই সৃষ্টির ঊষাকাল থেকে পাখির সঙ্গে মানুষের এক নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। ফলে প্রাচীন কাল থেকে মানুষ পাখির জীবন অনুসন্ধানে ব্রতী হয়। বস্তুত আমাদের জীবনের সঙ্গে পাখি আজ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

পাখির সঙ্গে আমাদের নিবিড় সম্পর্ক অপার্থিব ও ব্যাক্তিগত। অন্যদিকে সভ্যতা গড়ে উঠেছে মানুষের জৈবিক প্রয়োজনের তাগিদে। পাখির জীবন-লীলা, প্রাণসত্বা, সঙ্গীত-সুধা ও বৈচিত্র্যময় রূপ ব্যঞ্জনা মানুষকে এমনভাবে অভিভূত করেছে যে সে পাখিকে দেবতার আসনে বসিয়ে পূজো করেছে, ভাস্কর্য ও শিল্পকলায় তাকে নানাভাবে মূর্ত করেছে, আর সাহিত্য ও গল্প-গাথায় পাখির সামগ্রিক জীবন ধারাকে নিপুণভাবে পরিস্ফুট করে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছে।

অন্য দিকে পাখি যুগ যুগ ধরে মানুষের অন্যতম খাদ্য রূপে চিহ্নিত হয়েছে। খাদ্য, বস্ত্র ও বেঁচে থাকার অনেক উপাদান আমরা পাখির কাছে পাই। পাখির অনন্য বর্ণময় পালকের প্রতি অতিরিক্ত আসক্ত হয়ে মানুষ পাখি নিধনেও প্রবৃত্ত হয়। এছাড়া পরিযানের সময় পাখি কিভাবে দিগ্‌নির্ণয় করে তার চিন্তা ভাবনা করতে করতে মানুষ শিখে নিল তাদের পদ্ধতি—চন্দ্র, সূর্য ও নক্ষত্রের সাহায্যে দূর-দূরান্তে চলার নিশানা মানুষ পাখির কাছ থেকে গ্রহণ করলো। পাখির ওড়ার ভঙ্গিমা দেখে মানুষ উড়োজাহাজ বানালো। তাছাড়া আমরা যেসব খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করি তা কি পরিমাণে বিষাক্ত বা তেজস্ক্রিয় হয়েছে তার নির্ভুল ইঙ্গিতও পাখি দেয়। পাখির বিপদসূচক ডাক মানুষকে নানা প্রাকৃতিক বিপদ থেকে রক্ষা করে এসেছে।

প্রায় পনের কোটি বছর আগে সরীসৃপ প্রাণী থেকে উদ্ভূত হয়ে দ্রুত বিকিরণের ফলে পাখি পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। তাই তুষারাচ্ছন্ন মেরু অঞ্চল, অভ্রভেদী হিমালয় ও এনডিয়েন পর্বতমালার শিখরদেশ থেকে আরম্ভ করে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ মহাসাগর, গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন বনভূমি, তাপক্লিষ্ট মরুভূমি, সমুদ্রের তলদেশ, জনাকীর্ণ জনপদ কিংবা সূচীভেদ্য অন্ধকার গুহার মধ্যেও

পাখির পদার্পণ ঘটেছে। আবার এই বৈচিত্র্যময় পরিবেশে অভিযোজনের ফলে পাখির আকার, বর্ণ ও আচরণের এত ব্যাপকতা দেখা যায়।

বর্তমানে পৃথিবীতে ৮৫৫৪ প্রজাতির পাখি রয়েছে। তার মধ্যে প্রাকৃতিক সম্পদের উজ্জলে দীপ্যমান ও বৈচিত্র্যময় ভারতে প্রায় ১২০০ প্রজাতির পাখি পাওয়া যায়। কিন্তু ক্রমবর্ধমান জনস্ফীতি, বনাঞ্চল ধ্বংস ও পরিবেশ দূষণের ফলে সমস্ত পৃথিবীতে পাখির জীবন আজ বিপন্ন। এইসব কারণে বর্তমান কালের মধ্যে ৭৮ প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটেছে এবং আরও অনেক প্রজাতির পাখি বিলুপ্তির সীমানায় দাঁড়িয়ে অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করছে। তবুও মানুষ ধ্বংসের হাত থেকে পাখিকে রক্ষা করার জন্য চেষ্টা করছে। আজ পাখির জীবনের বড় সমস্যা মানুষের পরিবেশে বেঁচে থাকা।

অন্তরীক্ষের অধিপতি হতে গিয়ে পাখিকে তার শরীরের কাঠামো ও শারীর অভ্যন্তরের তন্ত্রসমূহে ও তাদের কার্যকারিতায় আমূল পরিবর্তন আনতে হয়েছে। আকাশে ওড়ার অধিকার অর্জন করতে প্রকৃতির কাছে পাখি পেলো ডানা, পালক, ফাঁপা হাড়, বিচিত্র শ্বাসতন্ত্র, বায়ুথলি, বেশ মজবুত হৃদপিণ্ড এবং অত্যন্ত শক্তিশালী বক্ষপেশী। এছাড়া শরীরকে হাল্কা করার জন্য দাঁত ও চোয়াল বিসর্জিত হলো, পরিত্যক্ত হলো মেয়ে পাখির এক দিকের জননতন্ত্র। অন্যদিকে বক্ষ-গহ্বর প্রশস্ত হয়ে হাওয়া পূর্ণ হলো। পালক যাতে সিক্ত হয়ে না যায় তার জন্য মর্মগ্রন্থি ত্যাগ করতে পাখি কুণ্ঠিত হলো না। শরীরের ফাঁপা ও হাল্কা হাড় দৃঢ় করার জন্য এর ভেতরে ট্রাসের মতো অবলম্বন সৃষ্টি হলো – যেমন উড়োজাহাজের ডানায় থাকে। বক্ষপিঞ্জরের সরু, লম্বা ও গ্রন্থিযুক্ত হাড়গুলি শ্বাসগ্রহণ ও ওড়ার সময় বিশেষভাবে সাহায্য করে। আবার দৃঢ়তা আনার জন্য ঐ হাড়গুলি একটা আর একটার উপর বিস্তৃত। আকাশ থেকে নীচে নামার সময় 'অবতরণ যন্ত্র' (পদ যুগল) বাইরের শব্দ হলে যাতে গুটিয়ে না যায় তার জন্য পাখির বহিকর্ণ বিবর্জিত হয়েছে। দ্রুত বিপাকীয় কাজের জন্য প্রচুর শক্তির প্রয়োজন তাই পাখির শরীরে শর্করার পরিমান স্তন্যপায়ী প্রাণী অপেক্ষা দ্বিগুণ। অতিরিক্ত বিপাকীয় কাজের ফলে পাখির শরীরে প্রচুর তাপ সৃষ্টি হয় এবং তাই শরীরকে ঠাণ্ডা রাখার জন্য আবির্ভাব হলো 'বায়ুথলি'। পাখির রক্তচাপ স্তন্যপায়ী প্রাণী থেকে অনেক বেশী ; যেমন পায়রার ক্ষেত্রে তা ১৪০ মিমি, মুরগীর ১৮০ মিমি। পাখি যেসব খাদ্য গ্রহণ করে তার প্রায় ৩৮% ব্যবহার করে, কিন্তু স্তন্যপায়ী

প্রাণীর ক্ষেত্রে এর পরিমান মাত্র ১০%। আকাশে ওড়ার জন্য ইঞ্জিনের কাজ করে এদের বক্ষপেশী। সাধারণভাবে এর ওজন পাখির শরীরের প্রায় অর্ধেক। মানুষ ওড়ার চেষ্টা করলে তার ঐ পেশীর গভীরতা প্রায় চার ফুট হওয়া দরকার। এছাড়া পাখির শরীরের যেদিকেই নজর পড়ুক না কেন দেখা যাবে যে কোনো এক অদৃশ্য কারণে কোন এক রহস্যময় শিল্পী নিপূণভাবে তার সমস্ত কলা-কৌশল ও চাতুর্য দিয়ে পাখিকে রূপায়িত করে স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল জয়ের জন্য সৃষ্টি করেছে।

সূচীপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

পাখি ও বনজ সম্পদ

সৃষ্টির ঊষাকাল থেকেই বন-জঙ্গলের সঙ্গে মানুষ অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িয়ে পড়েছে। মানুষের বাঁচার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য-সম্ভারের প্রধান উৎস ঐ বনভূমি। তাই সঙ্গত কারণেই বনজ-সম্পদকে 'সবুজ সোনা' বলে অভিহিত করা হয়েছে। তাছাড়া কোনো স্থানের আবহাওয়া, বন্যা বা খরা প্রভৃতির রূপায়ণে বন-জঙ্গলের দান অপরিসীম। এই 'সবুজ সোনা' বা বনজ সম্পদ বৃদ্ধিতে পাখির ভূমিকা নিয়ে কিছু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

বিভিন্ন সমীক্ষা থেকে জানা গেছে যে বহু অর্থকরী গাছের পরাগ-যোগ ও বীজ-বিস্তার নানা ধরনের পাখির উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। যেমন, নিত্য প্রয়োজনীয় দেশলাই, শিমূল গাছের কাঠ দিয়ে তৈরি হয়। শিমূল ফুলের পরাগ-যোগ শালিক, গো-শালিক, জঙ্গলী-শালিক, ছাতারে প্রভৃতি পাখির সাহায্যে ঘটে থাকে। বসন্ত কালে শিমূল ফুল ফোটে। আবার ঐ সময় থেকেই ঐ সব পাখির দল প্রজননের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। প্রজননের জন্য প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত শর্করা সংগ্রহের আগ্রহেই পাখির দল ফুলের মধুর সন্ধানে ছোটে। ফুলের মধুর প্রধান অংশ 'সুক্রোজ, ফ্রুকটজ ও গ্যালাকটজ প্রভৃতি শক্তিবর্ধক শর্করা। তাছাড়া এর মধ্যে কিছু পরিমাণে ডেট্রিন, ইথেরিওল তেল ও নানা রকম ধাতব লবণ পাওয়া যায়। বসন্তকালে পাখিদের কাছে মধুর আকর্ষণ এত প্রবল হয় যে ঐ সময় তারা অন্যান্য খাদ্যবস্তু বর্জন করে সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত ফুলের মধু আহরণে ব্যস্ত থাকে। সমীক্ষায় জানা গেছে যে বর্তমানে পৃথিবীতে ৫৫০ টি বংশের প্রায় এক হাজার প্রজাতির পাখি ২১০ টি বংশের কয়েক হাজার গাছের পরাগ সংযোগ ঘটায়। এদের মধ্যে সানবার্ড, হানিইটার, হানিক্রিপার, ফ্লাওয়ার পেকার ও দক্ষিণ আমেরিকার হামিং বার্ড-এর প্রধান খাদ্য ফুলের মধু।

দক্ষিণ ভারতে কফি গাছের চারাকে রোদের দাহনল থেকে রক্ষার জন্য মাদার গাছের চাষ করা হয়। এবং এই গাছের পরাগ-যোগ শালিক, বেনেবৌ ইত্যাদি পাখির দ্বারা হয়ে থাকে।

খেলাধূলার বিভিন্ন সাজ সরঞ্জাম রপ্তানি করে ভারতবর্ষ প্রতিবছর অনেক বিদেশীমুদ্রা অর্জন করে। ঐ সব সামগ্রীর বেশিরভাগই তৈরি করা হয় তুঁত গাছ থেকে। সাতভাই বা ছাতার, বেনেবৌ, ফটিকজল, বুলবুল প্রভৃতি পাখি তুঁত ফলের অত্যন্ত ভক্ত। পাখির খাদ্যনালীর মধ্য দিয়ে যাবার সময় তুঁত ফলের শাঁসটুকুই হজম হয় কিন্তু বীজ অপরিবর্তিত অবস্থায় পাখির বিষ্ঠার সঙ্গে পরিত্যক্ত হয়। কিন্তু ঐ বীজের জীবনশক্তি (germination power) অক্ষুণ্ণ থাকে। তাছাড়া তুঁত ফলের বীজ পাখির খাদ্যনালীর মধ্য দিয়ে যাবার সময় পাকস্থলির এনজাইমের কার্যকারিতায় রাসায়নিক বিবর্তন ঘটে ও নরম হয়ে পড়ে। এরপর পাখির বিষ্ঠার সঙ্গে নির্গত তুঁত বীজ যে স্থানেই পড়ুক না কেন অতি অল্প সময়ের মধ্যে চারাগাছে পরিণত হয়। আর যে সব তুঁতের বীজ পাখির খাদ্যনালীর মধ্য দিয়ে স্থানান্তরিত হয় না তাদের থেকে অত্যন্ত দুর্বল চারাগাছের উৎপত্তি হয়। এ ছাড়া অতি মূল্যবান চন্দন গাছের বীজও এইভাবে বুলবুল, বসন্তবৌরি প্রভৃতি পাখির দ্বারা দূরদূরান্তে ছড়িয়ে থাকে।

বেশ কিছু পাখি যেমন, ন্যাটক্রাকার, টিট, নরওয়ের ক্রেস্টেড টিট ভবিষ্যতের খাদ্য হিসাবে বাদাম ও অন্যান্য শুকনো ফল সংগ্রহ করে তাদের পছন্দমত স্থানে জমা করে রাখে। ন্যাটক্রাকার বাদাম ও ওকগাছের বীজ ছোটো ছোটো গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে রেখে মস ও লাইকেন দিয়ে ঢেকে দেয়। দক্ষিণ আমেরিকার অ্যাক্রন কাঠঠোকরা শীতের খাদ্য হিসাবে নানাস্থানে অ্যাক্রন জমা করে রাখে। কিন্তু প্রায় দেখা যায় ঐ লুকানো খাদ্য পাখিরা পরে আর খুঁজে বের করতে পারে না। এইভাবে জমা করা বাদাম বীজ কিছুদিনের মধ্যেই অঙ্কুরিত হয়ে গাছে পরিণত হয়। বাদাম গাছ তাই আজ ইউরোপের নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়েছে। বায়স বংশভুক্ত ইউরোপের জে পাখি অত্যন্ত নিপুণ ভাবে ওকগাছের চারা বপন করে। ফলে ইউরোপে ওকগাছের এত প্রসার। ধূসর বর্ণের টিয়া ও আরও কয়েকটি প্রজাতির পাখি অয়েল পাম গাছের ফল মুখে করে অনেক দূরে নিয়ে যায়। ফল নিয়ে উড়ে যাবার সময় পাখিদের মুখ থেকে তা প্রায়ই পড়ে যায়। এরই জন্য আফ্রিকার বনাঞ্চলে অয়েল পাম বিশেষভাবে বিস্তার লাভ করেছে।

বিভিন্ন রসাল ফল গাছের বীজ বিস্তারও নানারকম পাখির দ্বারা হয়ে থাকে। ফল যখন পাকে এবং সবুজ রং লাল বা হলুদ বর্ণ ধারণ করে তখন দলে দলে বসন্তবৌরি, বুলবুল, বেনেবৌ, টিয়া, মুনিয়া প্রভৃতি পাখি ঐ সব ফল

খেতে দূর-দূরান্ত থেকে চলে আসে। পাকা ফলে শর্করা, প্রোটিন ও প্রয়োজনীয় ধাতব লবণ—যথা, ফসফরাস, লোহা, ক্যালসিয়াম প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় [পরিশিষ্ট, ১]। ফরাসী দেশে ৫১ টি প্রজাতির পাখিকে এলাচ খেতে দেখা গেছে। আর পানামায় ২৪টি প্রজাতির পাখি সিরোপিয়া গাছের ফল খাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

দেশান্তরে যাবার আগে পরিযায়ী পাখিদের শরীরে প্রচুর পরিমাণে চর্বি জমা হয়। দেখা গেছে যে ঐ সব পাখি সে-সময় অন্যান্য খাদ্য না খেয়ে ফলের প্রতি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হয়। যেমন দক্ষিণ সাহারার ছোটো-খাটো পরিযায়ী পাখি দেশান্তরে রওনা হওয়ার আগে প্রচুর পরিমাণে সালভেডোরা গাছের ফল খেয়ে থাকে। ইউরোপে পরিযায়ী পাখির ক্ষেত্রে ঐ একই ব্যাপার ঘটে। এই ভাবে রসাল ফলের বীজ দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। আমাদের দেশে নিম, দেবদারু, খেজুর, কালোজাম প্রভৃতি গাছের ফল শালিক, কোকিল, বুলবুল, বেনেবৌ, ফটিকজল ইত্যাদি পাখির বিশেষ প্রিয়। এ সব ফলের বীজ পাখির বিষ্ঠার সঙ্গে পরিত্যক্ত হয়ে স্থানান্তরিত হয়।

মরিসাস দ্বীপে ডোডো পাখি অবলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ওই দ্বীপের একটি বহুল পরিচিত গাছ ক্যালভেরিয়া মেজর-ও দ্রুত অবলুপ্তির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। ডোডো পাখি ক্যালভেরিয়ার বীজ খেতে খুব পছন্দ করতো। ক্যালভেরিয়ার বীজ ডোডোর খাদ্যনালীর মধ্য দিয়ে পরিক্রমার সময় অন্ত্রের বিভিন্ন রসের কার্যকারিতায় বীজের জীবনীশক্তি নষ্ট হতো। আত্মরক্ষার জন্য প্রকৃতির নিয়মে কালক্রমে ক্যালভেরিয়ার বীজের এনডোকার্প অভিযোজিত হয়ে বেশ শক্ত ও পুরু হলো। ফলে ডোডোর অন্ত্রের মধ্য দিয়ে পরিক্রমার সময় ঐ শক্ত এনডোকার্প-যুক্ত ক্যালভেরিয়ার বীজ তার জীবনীশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হলো। অন্যদিকে অন্ত্রের বিভিন্ন রসের কার্যকারিতায় এনডোকার্পের উপরি-ভাগ সামান্য ক্ষয়ে যায়। এর ফলে পাখির বিষ্ঠার সঙ্গে ক্যালভেরিয়া গাছের বীজ পরিত্যক্ত হবার পর সহজেই নতুন চারা গাছের সৃষ্টি হতো। কিন্তু ক্যালভেরিয়া গাছের যে সব বীজ সরাসরি মাটিতে পড়তো তাদের ভ্রূণ ঐ শক্ত ও পুরু এনডোকার্প ভেদ করে বেরিয়ে আসতে অক্ষম হলো। ফলে ডোডো পাখি অবলুপ্তির পর এই তু-শ বছরের মধ্যে মরিসাস দ্বীপে আর কোনো নতুন ক্যালভেরিয়া গাছ জন্মাতে পারে নি। তিনশ বছরের পুরোনো তেরটি ক্যালভেরিয়া গাছ বর্তমানে মরিসাস দ্বীপে অবশিষ্ট রয়েছে। এই একটা

উদাহরণ থেকেই প্রাণী ও উদ্ভিদের নিবিড় সম্পর্কের কথা বেশ বোঝা যায়। একের অবলুপ্তি অন্য অনেক প্রাণী ও উদ্ভিদকে দ্রুত অবলুপ্তির পথে নিয়ে গিয়ে প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট করে দেয়।

২। পাখি ও কৃষিদ্রব্য

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ এবং প্রায় ৮০% মানুষের জীবিকার উৎস কৃষি এবং কৃষিজাত দ্রব্য। এবং জাতীয় আয়ের ৪৭% কৃষিজাত সামগ্রী থেকে আসে। হিসেবে প্রকাশ আমাদের উৎপন্ন শস্যের প্রায় একশ লক্ষ টন বিভিন্ন কারণে নষ্ট হয়। এর প্রায় ৫০ ভাগ নানা ধরনের কীটপতঙ্গের দ্বারা বিনষ্ট হয়। কৃষিদ্রব্যের প্রতি কীট-পতঙ্গের আক্রমণ বা আকর্ষণের ঐতিহাসিক কারণ আছে। ক্রমবিবর্তনের খেলায় কীট-পতঙ্গ ও স্থলভাগের উদ্ভিদ প্রায় একই সময়ে পৃথিবীতে দেখা দেয়। আবার কৃষিকার্য আবিষ্কার ও প্রসারের সময় থেকে কীটপতঙ্গের বিরাট এক অংশ পরজীবীতে পরিবর্তিত হয়ে কৃষিজ দ্রব্যের বিনাশে প্রবৃত্ত হলো। তাই প্রায় সমস্ত গাছপালাই কোনো না কোনো কীটপতঙ্গের খাদ্য-বস্তু হয়ে পড়েছে। ফলে যুগ যুগ ধরে একই খাদ্যের জন্য মানুষকে কীটপতঙ্গের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হচ্ছে।

এর ফলে আমাদের কৃষিজ খাদ্যদ্রব্য যথা—ধান, গম, যব, ডাল, তৈলবীজ, আখ, তুলো ও নানা রকম ফল কীটপতঙ্গের আক্রমণে প্রচুর পরিমাণে নষ্ট হয়ে থাকে। বিভিন্ন কীটপতঙ্গের প্রজনন ক্ষমতা ও তাদের শস্য ক্ষতি করার পরিমাণের কিছু সমীক্ষা করা হয়েছে। কোনো রকম বিপদে না পড়লে এক জোড়া পোটাটো বাগ বা আলু পোকা থেকে বছরে প্রায় ৬০ লক্ষ নতুন পোকার সৃষ্টি হতে পারে। আমেরিকার শস্যক্ষেত্রের সবচেয়ে বিপজ্জনক পতঙ্গ 'হপ এপিস' বছরে তেরবার ডিম পাড়ে এবং প্রতিবারে তার সংখ্যা কয়েক হাজার। শস্য-ক্ষেত্রের আর একটি মারাত্মক শত্রু পঙ্গপাল। বছরে প্রায় দশ হাজার ডিম পাড়তে পারে। পঙ্গপালের শূককীটগুলি প্রতিদিনে নিজেদের দেহের ওজনের থেকে বহুগুণ বেশি শস্য খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। আবার প্রতিটি রেশমকীট দিনে তাদের দেহের ওজন থেকে অনেক বেশি তুঁত পাতা খেয়ে থাকে। কীটপতঙ্গের এই রকম মারাত্মক খিদের হাত থেকে রক্ষা পাবার যদি উপায় না থাকতো তবে অনেক আগেই পৃথিবীর বুক থেকে সমস্ত উদ্ভিদ নিশ্চিহ্ন হতো ও মানুষের বিলুপ্তি ঘটাত। কিন্তু তা হয় নি কারণ প্রকৃতির নিয়মেই বিভিন্ন

শালিক, ফিঙে, তুলিকা বা পিপিট, ভরতপাখি, কসাই পাখি, ফটিকজল, টুনটুনি প্রভৃতি পাখির প্রধান খাদ্য ঐসব অনিষ্টকারি কীটপতঙ্গ। কাজেই শস্যক্ষেত্র সম্পূর্ণ বিনষ্ট হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছে।

কয়েক বছর আগে বর্তমান লেখক (১৯৬৮, ১৯৭৪) শালিক পাখির উপর নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেছেন যে ঐ পাখির খাদ্যের ৮৪% হচ্ছে নানা রকম শস্য-বিনষ্টকারি কীটপতঙ্গ। প্রতিদিন এক একটি শালিক পাখি প্রায় ৩০ গ্রাম অর্থাৎ মাসে ৯০০ গ্রাম কীটপতঙ্গ খায় (পরিশিষ্ট, ২-৩)। বর্ষার কিছু আগে ও বর্ষা ঋতুতে ঐ খাদ্যের পরিমাণ আরও বেড়ে যায়। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে যে ঐ সময় ধান চাষের পক্ষে বিশেষ অনুকূল এবং তখনই খরিপ চাষ আরম্ভ হয়। চাষ আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে আবার কীটপতঙ্গের আক্রমণও বাড়তে থাকে। কিন্তু বিভিন্ন পতঙ্গভূক পাখি যেমন, রোজী পাসটর, স্টর্ক, রেণ, বক, ফিঙে, ওয়ার্বলার, টিট, শালিক, গো-শালিক, কসাই-পাখি, ষ্টারলিং, চড়াই শস্যক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে কীটপতঙ্গ ধ্বংস করে থাকে। সাদা স্টর্ক পঙ্গপালের ডিম বিশেষভাবে নির্মূল করে থাকে। অন্যান্য স্টর্ক ও বক, ফড়িং ও ঝিঁঝিঁ পোকার প্রধান শত্রু। ফ্লাইক্যাচার বা চুটকি, ওয়ার্বলার বা ফুটকি ও ফিঞ্চ গাছের ডালে ডালে সারাদিন কাটিয়ে দেয়। কাঠঠোকরা গাছের কাণ্ড ফুটো করে তার ভিতর থেকে লুকিয়ে থাকা কীটপতঙ্গ বের করার জন্য সারাদিনই ব্যস্ত থাকে।

অন্যদিকে এও দেখা গেছে যে এক জোড়া স্টারলিং দিনে প্রায় ৩৭০ বার কীটপতঙ্গ মুখে করে নিয়ে তার বাচ্চাদের খাওয়ায়। চড়াই প্রায় ২৫০ বার ঐ একই কাজ করে থাকে। সমীক্ষায় দেখা গেছে যে এক জোড়া টিট ও তার তিন-চারটে শাবক মিলে বছরে প্রায় বার কোটি কীটপতঙ্গের ডিম নষ্ট করে।

আমেরিকার লার্ক বানটিং-এর খাদ্যের ৬২% ও লঙস্পার পাখির খাদ্যের ৭৫% ই হচ্ছে কীটপতঙ্গ (চিত্র নং ১)। পাখি ও কীটপতঙ্গের এই জীবন-মরণ সংগ্রাম অনন্তকাল ধরে চলে আসছে। পাখির জয়যাত্রা যতদিন বজায় থাকবে ততদিন আমাদের জীবন-ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণও শেষ হয়ে যাবে না।

আবার এমন অনেক পাখি আছে যারা নানাভাবে কৃষিজ দ্রব্যের অনেক ক্ষতি করে। বিভিন্ন রকমের টিয়া, মুনিয়া, চড়াই, পরিযায়ী বানটিং ও স্পেনদেশের চড়াই বছরের বেশিরভাগ সময় বন্য উদ্ভিদের বীজ খেয়ে জীবন-

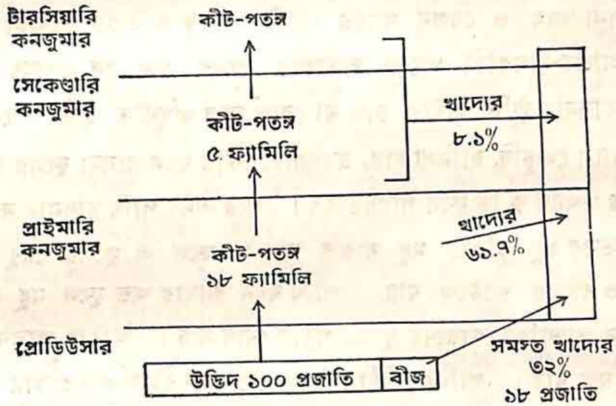
ধারণ করে। কিন্তু ধান, গম, যব প্রভৃতি গাছে দানা আসার সঙ্গে সঙ্গে ওরা ঐ সব উদ্ভিদের বীজ খাওয়া পরিত্যাগ করে শস্য দানার প্রতি আকৃষ্ট হয়। পরীক্ষায় দেখা গেছে যে শস্যভূক পাখি নিজ ওজনের প্রায় ৫০ ভাগ শস্য আহার করে থাকে। অন্যান্য পাখির মধ্যে বাবুই ধানের প্রচুর ক্ষতি করে। বর্তমান লেখক সমীক্ষা চালিয়ে দেখেছেন যে খরিপ চাষের মরশুমে ভারতের সর্বত্র বাবুই পাখি খাদ্য হিসাবে ধানকে গ্রহণ করে। ঐ সমীক্ষায় প্রকাশ যে প্রায় ২৫ গ্রাম ওজনের এক একটি পূর্ণাঙ্গ বাবুই দিনে ১০-১২ গ্রাম অর্থাৎ মাসে ১০০-২৪০ গ্রাম ধান খায়। কেরল, পাঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে সমীক্ষা চালিয়ে একই ফল পাওয়া গেছে। পশ্চিমবঙ্গে বিধিবদ্ধ রেশন এলাকায় একটি মানুষ দিনে প্রায় ১০০ গ্রাম চাল পায়। সুতরাং ১৬-১৭টি বাবুই একটি মানুষের দৈনিক আহার্য চাল নষ্ট করে। চুঁচুড়া কৃষি খামারে সমীক্ষা চালিয়ে এই লেখক দেখেছেন যে খরিপ চাষের সময় ঐ খামারের প্রতি একরে প্রায় ৫০০টির মতো বাবুই পাওয়া যায়। কাজেই ক্ষতির পরিমাণ সহজেই অনুমেয় (পরিশিষ্ট, ৪)।

টিয়া পাখীর শস্য ক্ষতি করার ক্ষমতা আরও ব্যাপক। এদের দৃষ্টি থেকে ধান, গম, যব, জোওয়ার, রাই কোনো কিছুই রেহাই পায় না। টিয়া পাখি আবার যত পরিমাণে খায় তার দ্বিগুণ শস্য নানাভাবে নষ্ট করে। বহুল পরিচিত চড়াই পাখি ধান, গম, যব, জোয়ার প্রভৃতি কোনো শস্যই তার খাদ্য তালিকা থেকে বাদ দেয় না। শীতকালে আবার পরিযায়ী বানটিং, স্পেনদেশের চড়াই ও স্টারলিং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে আরম্ভ করে এই উপ-মহাদেশের এক বিরাট অংশে শস্য সংহারে লিপ্ত থাকে।

পশ্চিম জারমানির হেজ শহরে সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে যে চড়াই পাখির খাদ্যের প্রায় ৪৮% শস্য দানা, ১২% উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ এবং ৩৬% অন্যান্য গাছের বীজ থেকে সংগৃহীত হয়। শস্য পাকার সময় চড়াইয়ের খাদ্যের প্রায় ৮০% আসে কৃষিজ দ্রব্য থেকে। এর মধ্যে গমের পরিমাণ প্রায় ৫৬%, ওট ২৩%, বার্লি ০.৮% ও রাই ০.৪%। গেছো চড়াইয়ের খাদ্যের প্রায় ৩২% আসে ওট ও গম থেকে (চিত্র নং ২)।

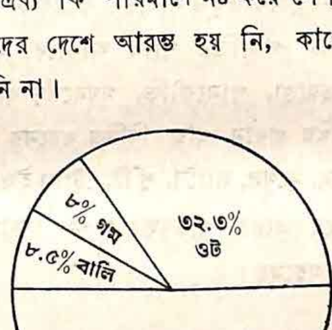
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে স্টারলিং-এর উপর সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে যে ঐ পাখি পনের রকমের শস্য ও আঙ্গুর, ডুমুর, চেরী প্রভৃতি ফলের প্রচুর ক্ষতি করে। অর্থের হিসাবে এর পরিমাণ কয়েক কোটি টাকা। এছাড়া হাউজ ফিঞ্চ প্রায় কুড়ি রকমের শস্যবীজ, এ্যাপ্রিকট, বেরী, চেরী, ডুমুর, আঙ্গুর,

পিয়ার্স, পীচ প্রভৃতি ফলের নিদারুণ ক্ষতি করে। হিসাবে দেখা গেছে এই ক্ষতির পরিমাণ ৮০০০,০০০ ডলার। এছাড়া ও-দেশের ধানের প্রধান শত্রু ব্ল্যাকবার্ড।



চিত্র নং ১—লার্ক বানটিং ট্রপিক লেভেল ও তার খাদ্যের উৎস।

পাখি বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য কি পরিমাণে নষ্ট করে সে বিষয়ে এখনও কোনো পূর্ণাঙ্গ গবেষণা আমাদের দেশে আরম্ভ হয় নি, কাজেই আর্থিক ক্ষতির পরিমাণও আমরা জানি না।



চিত্র নং ২—গেছো চড়াই-এর খাদ্যে বিভিন্ন শস্যের পরিমাণ।

এছাড়াও আরও কয়েক রকমের পাখি আছে যারা নানা কারণে চাষীদের ভয়ের কারণ হয়ে থাকে। প্রায় এক শতাব্দী আগে বাগানের সৌন্দর্য বাড়াবার জন্য মেক্সিকো থেকে এদেশে চোতরা গাছের আমদানি করা হয়েছিল। বর্তমানে

ঐ গাছ পরগাছার রূপ নিয়ে ভারতবর্ষের কয়েক সহস্র কিলোমিটার স্থান জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। অন্যান্য পাখির মধ্যে গো-শালিক চোতরা গাছের বীজ খেতে খুব পছন্দ করে এবং এই পাখির সাহায্যেই চোতরা গাছ আজ ভারতের সর্বত্র বিস্তার লাভ করেছে।

রাসনা আম ও সেগুন গাছের একটি অত্যন্ত ক্ষতিকর পরগাছা। এর শিকড় আশ্রয়-দানকারী গাছের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে রস শোষণ করে। বিষাক্ত রাসনার কুঁড়ি বাইরে চাপ না পেলে ফুলে প্রস্ফুটিত হতে পারে না। মধুর সন্ধানে মৌচুষি, হানিসাকার, ফ্লাওয়ারপেকার যখন রাসনা ফুলের কুঁড়িতে চাপ দেয় তখনই কুঁড়ি ফুলে পরিণত হয়। পরে ঐসব পাখি রাসনার নলাকৃতি ফুলের ভেতর চঞ্চু ঢুকিয়ে মধু সংগ্রহ করে। ফলে ঐ ফুলের রেণু পাখির মাথায় ও শরীরে আটকে যায়। পাখি যখন আবার অন্য ফুলে মধু সংগ্রহে যায় তখন স্বাভাবিক কারণেই ফুলের পরাগ যোগ ঘটে। আবার অনেক পাখি রাসনার ফল খায়। পাখির বিষ্ঠার সঙ্গে পরিত্যক্ত বীজে এক প্রকার আঠাল পদার্থ থাকে। যার ফলে ঐ বীজ বিভিন্ন গাছে আটকে যায় এবং কিছুদিনের মধ্যে নতুন রাসনা গাছের জন্ম হয়।

যদিও পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষা হয়নি তবুও সাধারণ কয়েকটি সমীক্ষা থেকে জানা গেছে যে বেশ কয়েকটি প্রজাতির পাখি আমাদের মৎস্যজীবীদের রাতের ঘুম কেড়ে নেয়। মাছরাঙা, পানকৌড়ি, গগনভেড় বা পেলিক্যান, হেরন, স্নেকবার্ড প্রভৃতি পাখির প্রধান খাদ্য বিভিন্ন ধরনের মাছ যেমন—চিতল, কাতলা, ভেটকী, পারসে, মৃগেল, ল্যাটা, পুঁটি, টেংরা ইত্যাদি অর্থকরী মাছ। সমীক্ষায় দেখা গেছে যে এদের খাদ্যবস্তুর ৫০-৯০ শতাংশই মাছ। কাজেই ক্ষতির পরিমাণ সহজেই অনুমেয়।

৩। পাখি ও জনস্বাস্থ্য

বর্তমানে জানা গেছে যে কয়েক রকমের আরবো ভাইরাস পাখির সাহায্যে বিস্তার লাভ করে মানুষের মধ্যে রোগ ছড়ায়। কয়েক বছর আগে কর্ণাটকের সিমোগা জেলায় কাজিনুর বনাঞ্চলে ভাইরাস ঘটিত এক ধরনের সংক্রামক রোগ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। পুনার Virus Research Institute পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখল যে ঐ ভাইরাসের সঙ্গে রাশিয়ার Spring-summer encephalitis ভাইরাসের মিল আছে। এই জন্য অনুমান করা

হয়েছে যে Kasynur Forest Disease-এর ভাইরাস রাশিয়া থেকে পরিযায়ী পাখির সঙ্গে ভারতবর্ষে এসেছে। রাশিয়া থেকে দুটি পথে পরিযায়ী পাখি ভারতে প্রবেশ করে। একটি পথ এসেছে সিন্ধু নদ অববাহিকা ধরে, আর অন্যটি হচ্ছে ব্রহ্মপুত্র অববাহিকা। এই পথ দিয়ে ভারতে প্রবেশের পর পরিযায়ী পাখির দল মধ্য ভারতের দিকে অগ্রসর হয়ে এই উপদ্বীপের মাথায় মিলিত হয়। ভারতে আগত পরিযায়ী পাখি থেকে আরও কয়েক রকমের ভাইরাস আবিষ্কৃত হয়েছে। সংগৃহীত তথ্য থেকে জানা গেছে যে শীতকালে এখানে ভাইরাস ঘটিত যে সব রোগের প্রাদুর্ভাব হয় তার জন্য অনেক পরিযায়ী পাখি দায়ী। অর্নিথোসিস নামে আর একটি ভাইরাস ঘটিত রোগ মানুষের মধ্যে সংক্রামিত হয়। বিভিন্ন পাখির মধ্যে পায়রার দ্বারাই এ রোগ বিশেষভাবে মানুষের মধ্যে ছড়ায়। দেখা গেছে যে মধ্য বয়সের লোক এই রোগে বেশী আক্রান্ত হয়। অর্নিথোসিস রোগে আক্রান্ত মানুষ, মাথা ধরা কাঁপুনি, চঞ্চলতা, ঘুমের অভাব, নাক দিয়ে রক্ত পড়া, কাশি প্রভৃতি উপসর্গের শিকার হয়। তাছাড়া নিউমোনিয়ার কিছু উপসর্গও ঐ সময়ে আক্রান্ত মানুষের মধ্যে দেখা দেয়। পাখির শরীর থেকে নির্গত সূক্ষ্ম কণিকা শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে মানুষের শরীরে প্রবেশ করে অর্নিথোসিস রোগের ভাইরাসের প্রসার ঘটায়। এ রোগে মৃত্যুর হার প্রায় কুড়ি শতাংশ।

কিছু দিন আগে জানা গেছে যে কয়েক রকমের পাখি কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে এক রকমের হৃদরোগ ও বাত-এর প্রসার ঘটাচ্ছে। প্রায় কুড়ি বছর আগে এ রোগ জাপানে প্রথম দেখা দেয়। কাওয়াসাকি নামে এই রোগ বর্তমানে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে দেখা দিয়েছে। ১৯৭৭ সাল থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় ৮০০ জন কিশোর-কিশোরী আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে এ রোগে আক্রান্ত হয়েছে। আক্রান্ত রোগীর প্রায় দুই শতাংশ মারা গেছে।

যে বীজাণুর দ্বারা পাখির ক্ষয় রোগ হয় তার সঙ্গে মানুষের ও অন্যান্য প্রাণীর ঐ রোগ জীবাণুর অনেক সাদৃশ্য আছে। যদিও পাখির ক্ষয় রোগ বীজাণুকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা মানুষের আছে তবুও অনেক সময় পাখির দ্বারা মানুষের মধ্যে ক্ষয় রোগ হয়ে থাকে। এছাড়া গরু ও অন্যান্য গৃহপালিত প্রাণী পাখির দ্বারা ক্ষয় রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। পাখির ক্ষয় রোগ জীবাণু গরুর দুধ ও জরায়ুতে পাওয়া গেছে। ফলে অনেক ক্ষেত্রে গরুর গর্ভপাত হতেও দেখা গেছে।

এ ছাড়া বিভিন্ন ধরণের এনকেফালাইটিস রোগ বিস্তারে পাখির ভূমিকা কম নয়। কয়েক বছর আগে পশ্চিমবাংলার কয়েকটি স্থানে এক ধরনের রোগের প্রকোপ দেখা দিয়েছিল—যাকে এনকেফালাইটিস নামে অভিহিত করা হয়। এ কথা অনুমান করা চলে যে ঐ স্থানে কিছু পাখির সঙ্গে এ রোগের যোগাযোগ থাকা সম্ভব। জানিনা এ বিষয়ে কোনো ব্যাপক অনুসন্ধান করা হয়েছে কিনা।

৪। ইঁদুর শিকারী পাখি

আমাদের দেশের বিভিন্ন রকমের ইঁদুর একদিকে যেমন খাদ্যশস্যের বিপুল ক্ষতি করে অন্যদিকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে নানা রোগ-জীবাণু মানুষের মধ্যে ছড়ায়। এদেশের উৎপন্ন খাদ্যশস্যের ও গুদামজাত খাদ্যের প্রায় এক-দশমাংশ ইঁদুরের দ্বারা নষ্ট হয়। অন্যান্যের মধ্যে মেঠো ইঁদুরই ধান গাছের সব চেয়ে বেশি ক্ষতি করে। সিন্ধু উপত্যকায় মোল ইঁদুর উৎপন্ন ধানের ১০-১৫ ভাগ খেয়ে ও অন্যান্য ভাবে নষ্ট করে। এ ছাড়া বন-ইঁদুর কফি এবং তূলো বাগানের পরম শত্রু। বিভিন্ন ফলের গাছ ও অন্যান্য উদ্ভিদও বিভিন্ন ইঁদুরের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

প্রায় সারা বছর ধরে ইঁদুর তাদের প্রজনন কাজ অব্যাহত রাখে। প্রতিবারে এরা ৬-১০ বাচ্চা প্রসব করে। একটি নেংটি ইঁদুর বছরে প্রায় ৫০টি বাচ্চার জন্ম দেয়। নবজাত ইঁদুর শাবক একশ দিনের মধ্যে পূর্ণতা লাভ করে প্রজনন করতে সক্ষম হয়। কাজেই এই ক্ষুদ্র স্তন্যপায়ী প্রাণীর খাদ্যশস্য ও অন্যান্য উদ্ভিদজাত দ্রব্যের ক্ষতি করার পরিমাণ সহজেই অনুমেয়। কিন্তু যে পরিমাণে শস্য ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল তা হতে পারে না শুধু কয়েকটি ইঁদুরভুক পাখির জন্য। পেঁচা, ঈগল, পোকামারা বা কেসট্রেল, কসাই পাখি এদের পরম শত্রু। সমীক্ষায় দেখা গেছে এক একটি পেঁচা দিনে প্রায় ১২টি করে ইঁদুর খেয়ে থাকে। একটি সত্তর গ্রাম ওজনের কসাই পাখি দিনে প্রায় ৪০ গ্রাম ইঁদুর খায়। সুতরাং একটি পাখির এক জোড়া ইঁদুর খাওয়ার ফলে বছরে গড়ে ৮০০ নতুন ইঁদুরের জন্ম হতে পারে না।

শস্য ক্ষতি করা ছাড়াও বিভিন্ন রকমের ইঁদুর মানুষের জীবনে নানা রকম মারাত্মক রোগের সৃষ্টি করে। এদের দ্বারাই বিউবোনিক প্লেগ মানুষের মধ্যে বিস্তার লাভ করে। তাছাড়া ইঁদুরের কামড়ে দীর্ঘদিন ব্যাপী এক ক্ষয়িষ্ণু

রোগে মানুষ আক্রান্ত হয়। আস্তাবলের ঘোড়া ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে আক্রান্ত হলে ইঁদুরের মাধ্যমে তা অন্য আস্তাবলে ছড়িয়ে পড়ে। তাছাড়া ইঁদুরের স্পর্শে দূষিত হওয়া খাদ্য খেলে মানুষের শরীরে বিষক্রিয়া আরম্ভ হয় এবং তার থেকে জীবনহানিও ঘটে থাকে। কাজেই পেঁচা, ঈগল প্রভৃতি পাখি ইঁদুর নিধন করে একদিকে যেমন শস্য ক্ষতির পরিমাণ কমায়, অপরদিকে প্লেগ প্রভৃতি মারাত্মক রোগের হাত থেকে মানুষকে বহুলাংশে রক্ষা করে।

৫। মৃতদেহ সৎকার পাখি

বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে এসেও আমাদের শহরাঞ্চল ও গ্রামে উন্নত মানের পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা নেই এবং গৃহপালিত মৃত জীবজন্তুর দেহাবশেষ সৎকারের কোনো উপযুক্ত উপায় নেই। ফলে ঐ সব মৃতদেহগুলিকে কোনো রকম বাদবিচার না করে যেখানে সেখানে ফেলে দেওয়া হয় অথবা বাসস্থানের কাছেই কোনো স্থানে স্তূপীকৃত করে রাখা হয়। মৃতদেহগুলি কিছুক্ষণের মধ্যেই নানারকম বীজাণু দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং পরিবেশকে দূষিত করে তোলে। কিন্তু বিশেষ কিছু অঘটন ঘটার আগেই শকুন, চিল, কাক প্রভৃতি ঝাড়ুদার পাখির দল মৃতদেহগুলিকে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে খেয়ে ফেলে রোগ মহামারী থেকে গ্রাম ও শহরের মানুষকে রক্ষা করে। দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ ও সংক্রামক রোগে মৃত শত শত মানুষ ও পশুর দেহগুলি ঐ সব পাখি অতি অল্প সময়ের মধ্যে নিঃশেষ করে মনুষ্য সমাজকে আরও চরম বিপদের হাত থেকে রক্ষা করে।

পার্শী সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের মৃতদেহকে উন্মুক্ত আকাশের তলে (টাওয়ার অফ সাইলেন্স) রেখে শকুনের দ্বারা বিলীন করার রীতি আজও ঐ সমাজে প্রচলিত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১। পাখি ও কীটনাশক দ্রব্য

মানুষের কল্যাণে বিজ্ঞানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান বোধ হয় তার বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের আবিষ্কার ও ব্যবহার। এইসব রাসায়নিক দ্রব্য যথা, ডি. ডি. টি., ডাইএলড্রিম, হেপাটোক্লোর প্রভৃতি আজ মানুষের জীবনের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। প্রতি বছর কয়েক লক্ষ টন বিভিন্ন কীটনাশক দ্রব্য শস্যক্ষেত্রে ছড়ানো হয়। যদি এই সব পদার্থ শুধুমাত্র অনিষ্টকারী কীট-পতঙ্গের উপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তাদেরই ধ্বংস করতো তাহলে প্রাণী ও উদ্ভিদজগতে বিশেষ কোনো ক্ষতি হতো না। কিন্তু কীটনাশক দ্রব্য ব্যবহারের পর তা নানাভাবে বহুদূর পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয়ে উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানুষের দেহের মধ্যে প্রবেশ করে ক্ষতিকর মাত্রায় জমছে। তাছাড়া এসব দ্রব্যের বিষক্রিয়া বহুদিন পর্যন্ত সক্রিয় থাকে। এইভাবে কীটনাশক দ্রব্য পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করে উদ্ভিদ ও প্রাণীর অবলুপ্তির পথ পরিষ্কার করছে। এখানে তার কয়েকটির উদাহরণ দেওয়া হলো।

কীটনাশক রাসায়নিক দ্রব্য কোনস্থানে প্রয়োগের পর তাদের বিচূর্ণ জলের সঙ্গে চুঁইয়ে মাটিতে প্রবেশ করে। কিছু অংশ বৃষ্টির জলের সঙ্গে নদী হয়ে সমুদ্রে এবং সেখান থেকে দূর দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে। এই পথযাত্রায় ঐসব রাসায়নিক দ্রব্য জল, মাটি, জলচর প্রাণী যারই সংস্পর্শে আসে তাকেই বিষাক্ত করে। কাজেই ঐ বিষাক্ত দ্রব্য খাদ্যশৃঙ্খলের মধ্য দিয়ে পাখি ও অন্যান্য প্রাণীর দেহে প্রবেশ করে নানাভাবে তাদের উপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে। বারমুডা পেট্রেল বর্তমানে পৃথিবীর অন্যতম বিরল পাখি। এর সংখ্যা এখন মাত্র একশ। সমুদ্রে বসবাসকারী এই পাখি প্রজননের সময়েই কেবল ডাঙ্গায় আসে এবং বারমুডা ছাড়া অন্য কোথাও ডিম পাড়ে না। তবুও এদের শরীরে বিষাক্ত মাত্রায় ডি. ডি. টি. পাওয়া গেছে। মূল স্থলভূমি থেকে ৬৫০ মাইল দূরে অবস্থান করলেও সমুদ্রের খাদ্য-শৃঙ্খলের মধ্য দিয়ে এদের দেহে ডি. ডি. টি. প্রবেশ করেছে। ফলে বারমুডা পেট্রেল-এর প্রজনন ক্ষমতা ধীরে ধীরে কমে আসছে। সমীক্ষায় প্রকাশ যে আর কয়েক বছরের মধ্যে বারমুডা পেট্রেল তাদের প্রজনন ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে ফেলবে। ফলে আরও একটি পাখি কয়েক বছরের মধ্যে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

এছাড়া বলড্ ঈগল ও বহেরি বা পেরিগ্রিন প্রভৃতি পাখি যারা কীটনাশক দ্রব্য প্রয়োগক্ষেত্র থেকে বহুদূরে মেরুপ্রদেশে বসবাস করে তারাও ডি.ডি.টি.-এর প্রতিক্রিয়ায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে সংখ্যায় কমছে। ১৯৪৬-১৯৫০ সালের মধ্যে এইসব পাখির ডিম নষ্ট হয়ে যাবার পরিমাণ অত্যন্ত বেড়ে যায়। সমীক্ষায় ধরা পড়েছে যে ঠিক ঐ সময় পরিবেশে ডি.ডি.টি. প্রয়োগের পরিমাণও ছিল সবচেয়ে বেশী। ডি.ডি.টি., এলড্রিন, হেপাটোক্লোর প্রভৃতি কীটনাশক দ্রব্যের প্রতিক্রিয়ায় পাখির শারীরিক ও ব্যবহারিক যেসব পরিবর্তন আসে তার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

অল্পমাত্রায় ডি.ডি.টি.-র আক্রমণে অনেক পাখির ডিম ফুটে বাচ্চা হওয়ার সংখ্যা দিনে দিনে কমতে থাকে। আবার কখনো কখনো পাখি নিজেদের ডিমগুলি ভেঙ্গে ফেলে। পেরিগ্রিন, বহেরিবাজ, স্পারোহক বা শিকরে নীলশির প্রভৃতি পাখিকে দিনে ১৭০ ইউ. জি ডি.ডি.টি. খাইয়ে দেখা গেছে যে ওরা এর ফলে নির্দিষ্ট সময়ের অনেক পরে ডিম দিতে আরম্ভ করে। কিন্তু ঐ সময়ে তাদের বাসস্থানে উপযুক্ত খাদ্য না থাকায় অল্পদিনের মধ্যেই শাবকরা মরে যায়। নীলশির পাখিকে কয়েকদিন ধরে ৮০ পিপিএম ডি. ডি. টি. খাওয়ানোর পর দেখা গেল যে তাদের ডিম দেবার ক্ষমতা প্রায় যাটভাগ কমে গেছে। সমীক্ষায় আরও প্রকাশ যে ডি. ডি. টি., ডাইএলড্রিন ও বিভিন্ন হারবিসাইড জমিতে প্রয়োগের ফলে বহু পাখির প্রজনন ক্ষমতা প্রায় ৮০ শতাংশ কমে যায়। এছাড়া বিভিন্ন হারবিসাইড : এনড্রিন, এলড্রিন, ডাইএলড্রিন প্রভৃতি রাসায়নিক দ্রব্যের প্রতিক্রিয়ায় ফকন, হক, শকুনি, পেঁচা, সারস প্রভৃতি পাখির ডিম্বকোষ নিষিক্ত হতে পারে না বলে তারা বাওয়া ডিম প্রসব করে।

বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে এইসব রাসায়নিক পদার্থের প্রতিক্রিয়ায় পাখির ডিম আবরণীতে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ প্রায় ৮ শতাংশ কমে যায়। ফলে ডিম আবরণীর ঘনত্ব প্রায় বাইশ শতাংশ কমে যায় এবং ঐ আবরণী অত্যন্ত পাতলা হয়ে পড়ে। কাজেই 'তা' দেওয়া বড় পাখির শরীরের চাপে ডিমগুলি সহজেই ভেঙ্গে যায়।

পাখির ডিম আবরণীর উপযুক্ত ঘনত্বের জন্য শরীরে ঠিকমতো ক্যালসিয়াম মেটাবলিজমের প্রয়োজন। যৌন-ধর্মী হরমোন ইষ্ট্রোজেন-এর সাহায্যে খাদ্যের ক্যালসিয়াম অস্থিমজ্জায় জমা হয়। সেখান থেকে ক্যালসিয়াম ডিম্বনালীতে স্থানান্তরিত হয়ে ডিম্বাণুর আবরণীর অংশ হিসাবে জমা হয়। কিন্তু ডি.ডি.টি.

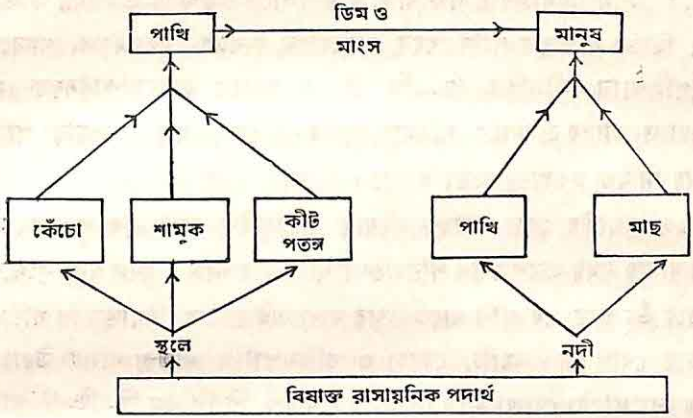
ডাইএলড্রিন প্রভৃতি ক্লোরিনেটেড় হাইড্রোকার্বন হেপাটিক মাইক্রোজোমাল এনজাইমকে প্রভাবিত করে ষ্টেরয়েড হরমোনকে ভেঙ্গে দিয়ে উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটায়। ফলে ডিম্বাণু উপযুক্ত ও নির্দিষ্ট পরিমাণে ক্যালসিয়াম পায় না। ফলে ডিম আবরণী পাতলা ও ক্ষণভঙ্গুর হয়ে পড়ে। তাছাড়া কীটনাশক দ্রব্যের প্রভাবে রক্তে ইসট্রাডিয়লের পরিমাণ কমে যায় ও পাখি প্রজনন ক্ষমতা হারায়। পরীক্ষায় প্রমাণ হয়েছে যে বিভিন্ন ঘুঘু পাখির শরীরে ১০ পিপিএম ডি.ডি.টি. জমা হলে ইসট্রাডিয়লের পরিমাণ কমতে থাকে।

এ ছাড়া ক্লোরিনেটেভ হাইড্রোকার্বন পেরিফিরাল স্নায়ুতন্ত্র এবং পরে মস্তিষ্ক ও যকৃৎকে আক্রমণ করে। ডি. ডি. টি. স্নায়ুতন্ত্রের কাছাকাছি আসামাত্র স্নায়ুর কার্যকারিতা কমে যায়, এবং বমি, কাঁপুনি, অতিমাত্রায় চাঞ্চল্য প্রভৃতি নানা রকম অসঙ্গতিপূর্ণ ব্যবহার পাখির মধ্যে দেখা দেয়। মস্তিষ্ক ও যকৃৎ ক্ষয় প্রাপ্ত হওয়ার ফলে হরমোনের কার্যকারিতা ব্যাঘাত ঘটিয়ে প্রজনন কাজে বাধা সৃষ্টি করে।

যে কোনো প্রাণীর আচরণ তার পরিবেশের সঙ্গে নিরবদ্ধভাবে অভিযোজিত হয়েছে। এই কারণে পাখি সমেত অন্যান্য প্রাণী তার নিজ পরিবেশে খাদ্য সংগ্রহ, আত্মরক্ষা ও প্রজননের জন্য সঠিক সঙ্গী নির্বাচন করতে পারে। দেখা গেছে যে পরিবেশে কীটনাশক দ্রব্য প্রয়োগের পর পাখি ও অন্যান্য প্রাণীর আচরণ বিশেষভাবে পাল্টে যায়। ফলে পাখি তার জীবন-চক্র পূর্ণ করতে পারে না। যেমন রাসায়নিক দ্রব্যের প্রতিক্রিয়ায় বহু পাখি তাদের শিখন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। আবার স্টর্ক, রবিন, স্টারলিং প্রভৃতি পরিযায়ী পাখি কীটনাশকযুক্ত খাদ্য খাওয়ার ফলে শীতের শেষে নিজ বাসভূমিতে ফিরে আসার তাগাদা অনুভব করে না এবং পরভূমিতেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আরও অনেক পাখি এর ফলে ডিমে 'তা' দেওয়ার কোনো আকর্ষণ অনুভব করে না বা অনেকে ডিম ফেলে রেখে নীড় ছেড়ে দূরান্তে চলে যায়। রবিন পাখি রাসায়নিক দ্রব্যের প্রতিক্রিয়ায় তার যাযাবরবৃত্তি পরিত্যাগ করে। অথচ এই যাযাবর প্রবৃত্তি রবিন পাখির জীবনের এক বিশেষ অধ্যায়।

পাখির শরীরে কীটনাশক রাসায়নিক দ্রব্য প্রবেশ করে খাদ্য-শৃংখলের মধ্য দিয়ে। মাটিতে ও জলে কীটনাশক দ্রব্য গিয়ে জমা হয়। খাবার সংগ্রহের সময় কেঁচো, শামুক, মাছ ও অন্যান্য প্রাণী খাদ্যের সঙ্গে মাটি ও জল গ্রহণ করে ফলে তাদের শরীরে তখন ঐ সব রাসায়নিক দ্রব্য প্রবেশ করে। আবার পাখি

খাদ্য হিসাবে কেঁচো, শামুক, মাছ প্রভৃতি খেয়ে তাদের শরীরে রাসায়নিক দ্রব্যগুলিকে নিয়ে আসে। যেমন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে এলম গাছকে ডাচ-এলম রোগ থেকে রক্ষা করার জন্য ডি. ডি. টি. প্রয়োগ করা হয়। কেঁচো ঐ গাছের



চিত্র নং ৩—বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থের পথপরিক্রমা।

পাতা খেয়ে বিষাক্ত হয়ে পড়ে। কিছুদিনের মধ্যে খাদ্য শৃংখলের মধ্য দিয়ে ডি. ডি. টি. ও তার বিপাকীয় বস্তু রবিন পাখির দেহে প্রবেশ করে বিষক্রিয়া আরম্ভ করে। ডি. ডি. টি. প্রয়োগের প্রথম বছরে ঐ কারণে প্রায় লক্ষাধিক রবিন পাখি প্রাণ হারায়।

বিভিন্ন ভাবে পাখির দেহে কীটনাশক রাসায়নিক দ্রব্য প্রবেশ করে কি পরিমাণে ডিম ও অন্যান্য কলার মধ্যে ক্ষতিকর মাত্রায় জমে তা পরিশিষ্টে দেওয়া হলো [পরিশিষ্ট, ৫-৬], (চিত্র নং ৩)।

নদী ও সমুদ্রের কাছাকাছি স্থানে শিল্প সম্প্রসারণের ফলে এবং স্থলভাগের বিভিন্ন দূষিত পদার্থ জলে নিক্ষেপের ফলে সমুদ্র, নদী ও অন্যান্য জলাশয় ধীরে ধীরে বিষাক্ত হয়ে পড়েছে। এই ক্রমবর্ধমান বিষাক্ততার জন্য নদী ও সামুদ্রিক মাছ, শামুক, শৈবাল প্রভৃতি বিভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদের দেহে ঐ সব বিষাক্ত পদার্থ জমা হচ্ছে। জলে বসবাসকারী পাখি, মাছ, শামুক প্রভৃতিকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে তারাও বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হচ্ছে। কলকারখানা নির্গত পেট্রোলিয়াম হাইড্রোকার্বন সামুদ্রিক পাখির অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটিয়ে তাদের লবণাক্ত পরিবেশে অভিযোজনের ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়।

নীলশির পাখির শাবক পি. সি. বি.-এর প্রকোপে ডাক হেপাটাইটিস ও আরও অন্যান্য রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। জলাশয়ে মারকিউরিক ক্লোরাইড-এর পরিমাণ দুই শতাংশ হয়ে পড়লে পাখির মৃত্যুর হার দাঁড়াবে প্রায় ৪০%। সীসা বিষক্রিয়ায় পক্ষাঘাত, খাদ্যনালীতে রক্তক্ষরণ ও হৃদযন্ত্র ক্ষতিগ্রস্থ হয়। বিভিন্ন মৎস্যভূক পাখি যেমন, মাছুমৌরন, অসপ্রে, বলডঈগল, গগনভেড় বা পেলিক্যান, নীলশির, ডি. ডি. টি. ও অন্যান্য হাইড্রোকার্বনযুক্ত মাছ খাওয়াতে তাদের ভ্রূণনষ্টের পরিমাণ প্রায় ৫০% বেড়ে যায়। এছাড়া পাখির ডিম্বাণু নিষিক্ত হওয়ার ক্ষমতা হারায়।

জল ও মাটির মধ্যে অবস্থিত বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য খাদ্য-শৃংখলের মধ্য দিয়ে যাবার সময় ক্রমশ বেশি পরিমাণে বিষাক্ত হয়ে পড়ে। ফলে খাদ্য শৃংখলের সবচেয়ে উঁচু স্তরে যে প্রাণী থাকে তার মধ্যে এই দ্রব্যের বিষাক্ততার পরিমাণ সবচেয়ে বেশি হয়। মাটি, কেঁচো ও রবিন পাখির খাদ্য-শৃংখলের উদাহরণ থেকে ব্যাপারটা বোঝা যাবে। মাটিতে যদি ৯ পি পি এম ডি. ডি. টি. থাকে

রবীন পাখি●	৪৪০ পি পি এম
	↑
কেঁচো●	১৪১
	↑
মাটি●	৯৯

চিত্র নং ৪—খাদ্য শৃংখলের মধ্য দিয়ে পরিক্রমার সময়
ডিডিটি ঘনত্ব বৃদ্ধির পরিমাণ।

এবং সেই মাটি কেঁচো খাওয়ার পর তার শরীরে ডি. ডি. টি.-র পরিমাণ দাঁড়াবে ১৪১ পি পি এম। এবং ঐ কেঁচো রবিন পাখি খাওয়ার পর তার দেহে ডি.ডি.টি.-র পরিমাণ গিয়ে দাঁড়াবে ৪৪০ পি পি এম। ঐ ডি.ডি.টি.-র প্রায় সমস্তই পাখির মস্তিষ্কে গিয়ে জমা হবে এবং তারা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে। ফলে খাদ্য ও খাদকের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে পরিবেশে অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে বিপর্যয় ঘটাবে। তাছাড়া কীটনাশক দ্রব্য-যুক্ত পাখির মাংস ও ডিম মানুষের খাদ্যের মধ্য দিয়ে তার শরীরে প্রবেশ করে নানা রকম রোগের সৃষ্টি করে এবং জীন-এর কার্যকারিতায় ব্যাঘাত ঘটিয়ে নানাপ্রকার বংশগত ত্রুটি সৃষ্টি করছে (চিত্র নং ৪)।

২। অম্লবৃষ্টি ও পাখি

বিগত তিরিশ বছরের মধ্যে অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য আমাদের বড় বড় শহরে ও তার উপকণ্ঠে অসংখ্য শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। প্রতিদিন ঐ সব শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিতে হাজার হাজার টন কয়লা কোক-কয়লা ও ফার্নেস অয়েল ইত্যাদি কারখানার চুল্লিতে পোড়ে এবং পেট্রোল ও ডিজেল ইঞ্জিন থেকে দূষিত ধোঁয়া নির্গত হয়ে বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ে। এর মধ্যে সালফার ও নাইট্রোজেন যোগের পরিমাণই বেশি। ঐ যোগ আকাশে ভাসমান অবস্থায় থাকে এবং বৃষ্টির জলের সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অম্লে পরিণত হয়ে পৃথিবীর জলে স্থলে নেমে আসে। এরই ফলে শিল্পনগরী ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় বৃষ্টির জলে অম্লের পরিমাণ বেড়ে যায়। অম্লতা বাড়ার দরুন জল ও স্থলের ইকোসিস্টেম-এর পরিবর্তন ঘটছে। ভারতবর্ষে ভরতপুর হ্রদে জলের অম্লতা কয়েক বছর হলো বেড়ে গেছে। এর ফলে সাইবেরিয়ার সারস, রোজি পেলিক্যান, রেডক্রেসটেড পোচার্ড ও সবুজ কাদাখোচা প্রভৃতি পরিযায়ী পাখি ভরতপুর হ্রদ পরিত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাচ্ছে। অনুমান করা হয়েছে যে Mathura oil Refinery নির্গত বায়োবীয় পদার্থের ফলে ওখানকার বায়ুর অম্লতা বেড়েছে এবং বৃষ্টির মাধ্যমে ভরতপুর হ্রদের অম্লতা বাড়ছে। কয়েক বছর ধরে কলকাতার চিড়িয়াখানায় পরিযায়ী পাখির সংখ্যা কম হতে দেখা গেছে। মনে হয় ঐ একই কারণে ওখানকার জলের অম্লতা বাড়ার ফলে পরিযায়ী পাখি চিড়িয়াখানায় আসতে চাইছে না।

বৃষ্টির জলের অম্লতা পাখির শরীরের উপর সরাসরি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তাছাড়া খাদ্য-শৃংখলের মধ্য দিয়ে দেহকে বিষাক্ত করে তোলে। সমীক্ষা করে দেখা গেছে যে জলাশয়ের অম্লতা যদি বেড়ে যায় অর্থাৎ জলের pH. 5·6 এর নীচে চলে যায় তবে পাখি ও অন্যান্য জলজ প্রাণীর প্রজনন-ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায় এবং ঐ অম্লতায় তাদের ডিম বেঁচে থাকতে পারে না।

৩। পাখি ও মোটরগাড়ির ধোঁয়া

মানুষের কল্যাণে বিজ্ঞানের আর এক বিস্ময়কর দান পেট্রোল ও ডিজেল চালিত মোটরগাড়ি। কিন্তু সুখপ্রদ যন্ত্রটি প্রতিদিন বিপুল পরিমাণে বিষাক্ত পদার্থ পরিবেশে মুক্ত করে সমস্ত বায়ুমণ্ডলকে দূষিত করে চলেছে। মোটর গাড়ির ধোঁয়া নির্গত পদার্থের মধ্যে সীসা ও কার্বন মনোক্সাইড প্রাণীর

শরীরের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। নির্গত পদার্থ বাতাসের সাহায্যে ভেসে গাছপালা এবং স্থলভাগের বিভিন্ন স্তরে জমতে থাকে। কিছু পদার্থ জলের সাহায্যে মাটিতে প্রবেশ করে এবং ভূগর্ভের সঞ্চিত জলে গিয়ে মিশে যায়। পাখি যখন গাছের ফল, ফুল, পাতা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে তখন ঐ সীসা পাখির শরীরে প্রবেশ করে। তাছাড়া মাটিতে ও জলে সঞ্চিত সীসা খাদ্যের মধ্য দিয়ে কেঁচো, শামুক ও অন্যান্য অমেরুদণ্ডী প্রাণী ও মাছের শরীরে প্রবেশ করে বিষ হিসাবে জমা হয়। দেখা গেছে যে বিভিন্ন অর্থকরী হাঁস যেমন, নীলশির, সরাল সীসা মিশ্রিত জল ও খাদ্য খেয়ে মরে যায়। সমীক্ষায় প্রকাশ যে পাখির শরীরে ২০০ পি পি এম-এর বেশি সীসা জমলে সে তা সহ্য করতে পারে না। সীসার বিষক্রিয়ায় পাখির মাংসপেশী শক্তিহীন হয়ে পড়ে। ফলে ডানা উত্তোলন বা ওড়ার সমস্ত শক্তি পাখি হারায়। তাছাড়া কয়েক দিনের মধ্যে হৃদযন্ত্রের গতি অনেক বেড়ে যায় এবং মস্তিষ্কে সীসার বিষক্রিয়ার ফলে অল্প সময়ের মধ্যে পাখির মৃত্যু ঘটে।

সীসাযুক্ত পাখির মাংস ও ডিম খাওয়ার ফলে ধীরে ধীরে মানুষও অসুস্থ হয়ে পড়ে। সীসা মানুষের রক্তনালীতে প্রবেশ করে লোহিত কণিকার সঙ্গে যুক্ত হয়ে শরীরের সর্বত্র বিচরণ করে এবং অবশেষে তা অস্থিমজ্জায়, মস্তিষ্কে ও বৃক্কতে গিয়ে জমা হয়। এর ফলে মানুষের স্নায়ুতন্ত্র তার কার্যকারিতা হারায়, মূত্রনালী ক্ষয়ে যায় এবং শরীরের রক্তও অনেক কমে যায়। অল্প বয়েসের শিশুর পক্ষে সীসার বিষক্রিয়ার ফল আরও মারাত্মক হয়। নানা রকম বিপজ্জনক উপসর্গ ছাড়াও গর্ভবতী নারীর এ জন্য গর্ভপাতও হয়ে থাকে। সমীক্ষায় দেখা গেছে যে প্রতি ১০০ মিলিলিটার রক্তে সীসার পরিমাণ যদি ৬০ ইউ জি-এর বেশি হয় তবে তা মানুষের পক্ষে ক্ষতিকারক।

৪। বনাঞ্চল ও জলাশয় সংহারে পাখির উপর প্রতিক্রিয়া

মানুষ ও পাখির নিবিড় সম্পর্ক ইকোলজির দিক থেকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ক্রমবর্ধমান জনস্ফীতি ও অর্থনৈতিক উন্নতির বিভিন্ন প্রকল্প বিগত তিরিশ বছরের মধ্যে ভারতের প্রাকৃতিক পরিবেশে আমূল পরিবর্তন এনেছে। মানুষের বাসস্থান ও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য তথাকথিত "স্থান সংগ্রহ পরিকল্পনা" (open up of areas) পাখি সমেত অন্যান্য প্রাণীদের ধ্বংসের পথে ঠেলে দিয়ে প্রকৃতির ভারসাম্য বিপন্ন করে তুলেছে। পরিবর্তিত

পরিবেশে পাখি বসবাসের জন্য উপযুক্ত স্থান পাচ্ছে না, ফলে ধীরে ধীরে বহু প্রজাতি বিরল থেকে বিরলতর হয়ে বিলুপ্তির পথে এগিয়ে চলছে। এখানে তারই কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হলো।

(ক) সল্টলেক :

কলকাতার পূর্বদিকে প্রায় ৩৯ বর্গমাইল স্থান জুড়ে লবণাক্ত জলের হ্রদকে ঘিরে এক বৈচিত্র্যময় প্রাকৃতিক পরিবেশ ছিল। সল্টলেকও তার চারপাশের বনরাজি বহু বিচিত্র পাখির বিশেষ করে হংস শ্রেণীর বিহঙ্গের স্বর্গভূমি বলে অভিহিত হতো। বিস্তীর্ণ জলাভূমি, প্রশস্ত জলাশয়, বিক্ষিপ্ত স্থলভাগ ও কৃষিভূমি, নানা রকম গাছপালা ও স্থানে স্থানে ছোট ছোট গুল্মরাজি এমন এক জীব আধার (biotype) সৃষ্টি করেছিল যা পরিযায়ী ও স্থানীয় পাখির আদর্শ বাসভূমি ছিল। সল্টলেকের বৈচিত্র্যময় পরিবেশে ৮০-টি পরিযায়ী প্রজাতি সমেত ২৪৮টি প্রজাতির পাখির সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল (পরিশিষ্ট ৭)। পাখি ছাড়াও ওখানে ২২টি প্রজাতির স্তন্যপায়ী ও অন্যান্য অমেরুদণ্ডী প্রাণীরও সাক্ষাৎ মিলতো। সল্টলেক ও তার সংলগ্ন স্থান হাজার হাজার বছর ধরে মানুষের কর্মকাণ্ডের ফলে রূপায়িত হয়েছিলো। শহর কলকাতার মানুষের বসবাসের স্থান সংকুলান না হওয়ায় ১৯৭০ সালে ঐ স্থানের উপর দৃষ্টি পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয় সংহার লীলা। কয়েক বছরের মধ্যে ইট ও লোহার তৈরি এক উপনগরী রূপময় প্রকৃতির ধ্বংসাবশেষের উপর গড়ে উঠলো। কিন্তু স্থানচ্যুত হলো ২৪৮ টি প্রজাতির লক্ষাধিক বর্ণময় পাখি ও অন্যান্য প্রাণী, সংকুচিত হলো প্রোটিন সরবরাহকারী মাছ চাষের অনুপম স্থান। কিন্তু তবুও কি কলকাতার মানুষের স্থান সংকুলানের সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়েছে ? হয়নি, তবে কেন এই অপরিণামদর্শী সংহারলীলা ?

(খ) সিঁথি—কলকাতার উত্তর প্রান্তিক অঞ্চল

এই অঞ্চলটিতে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত একটি স্নিগ্ধ গ্রাম্য পরিবেশের আমেজ পাওয়া যেতো। পাখি ও অন্যান্য প্রাণীর জীবন-ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সব রকম উপকরণ যথা, খাদ্য, বাসস্থান ও রুষ্ট সবই সেখানে ছিলো। প্রায় একশ একর জায়গা জুড়ে ঝিল, পুকুর, জলাভূমি ও নানা রকম গাছপালা নিয়ে স্থানটির একটা শ্যামল রূপ ছিলো। শিমূল, মাদার, বট, পলাশ, কৃষ্ণচূড়া, তাল, দেবদারু,

ও অসংখ্য নারকেল গাছের সমাহার দেখে বোঝা যেতো না যে সিঁথি রাজ্যপালের বাড়ী থেকে মাত্র ৬ মাইল উত্তরে অবস্থিত। স্থানে স্থানে ঝোপ-ঝাড়, বিশেষ করে চোতরা ও কালকাসুন্দি প্রায় সর্বত্রই ছড়িয়ে ছিলো। বর্ষার সময় সিঁথির এক বিরাট অংশ প্লাবিত হতো এবং সেই নতুন পরিবেশে জন্ম নিত অসংখ্য গুল্মরাজি। গ্রীষ্মকালে জায়গাটা শুকিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও ঝোপঝাড় থাকার জন্য কখনও ঐ স্থানটা রুক্ষ বা নগ্ন দেখাতো না। জলাভূমিতে বিভিন্ন ধরনের হাঁস, বক, কাদাখোচা, ডাহুক প্রভৃতির প্রাচুর্য ছিল। বসন্তের আগমনে মধুদেওয়া বৃক্ষরাজি যেমন, শিমূল, মাদার, পলাশ রক্তবর্ণ ফুলের পসার সাজিয়ে সকলকে আহ্বান জানাতো। ঐ সব ফুলের আকর্ষণে দূর-দূরান্ত থেকে বহু প্রজাতির অসংখ্য পাখি যেমন, শালিক, ঝুঁট-শালিক, ফিঙ্গে, ময়না, ফটিক জল মৌচুষি, পরাগ পাখি ও আরো অনেকে ফুলের মধুর সন্ধানে ঐ সব গাছের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তো। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত পাখির কলকাকলিতে সমগ্র অঞ্চলটা মাতোয়ারা হয়ে থাকতো। সুতরাং সিঁথির জলাভূমি, গাছপালা ও প্রান্তিক কৃষিক্ষেত্রের সমন্বয়ে এমন এক জীব-আধার সৃষ্টি হয়েছিল যা বহু পাখির ও অন্যান্য প্রাণীর এক নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ বাসভূমি ছিলো। [পরিশিষ্ট, ৮]

কিন্তু ১৯৬২ সাল থেকে জলাভূমি ও অন্যান্য জমি উদ্ধারের কাজ আরম্ভ হয়। কয়েক বছরের মধ্যে ঘর-বাড়ি, কল-কারখানা, গুদাম ঘর ও অন্যান্য শিল্প-প্রতিষ্ঠান ঐ স্থানে গড়ে উঠলো। এর সঙ্গে তাল রেখে বেড়ে চললো জন-সংখ্যা। সিঁথি অঞ্চলের শহুরিকরণের ফলে নিশ্চিহ্ন হলো পাখি সমেত অন্যান্য প্রাণীর খাদ্য ও বাসস্থান। ফলে তারা ঘর ছেড়ে উদ্বাস্তু হয়ে কোথায় গেল তার হদিশ আজ আর পাওয়া যায় না। তবে ছড়িয়ে থাকা কিছু গাছ-গাছড়ার ঝোপে ঝাড়ে কখন-সখন দু-চারটি বেনেবৌ, ফটিক জল ও কোকিল স্মৃতি রোমন্থন করতে অতীতের শান্ত নীড়ে আজও মাঝে মাঝে ঘুরে ফিরে আসে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পূর্বাভাসে পাখি

কোনো স্থানে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া, ভূমিকম্প ও অন্যান্য প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পূর্বাভাস জানাতে পাখি সক্ষম কিনা তা নিয়ে বর্তমানে কিছু মূল্যবান গবেষণা আরম্ভ হয়েছে। এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে যে সব তথ্য পাওয়া গেছে তার সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে।

ভারতের সর্বত্র বিচরণকারী ও সর্বজন পরিচিত শালিক পাখি কোন স্থানের আবহাওয়া পরিবর্তনের পূর্বাভাস দিতে পারে বলে সম্প্রতি জানা গেছে (সেন গুপ্ত ১৯৭৪)। দেখা গেছে যে শালিকের প্রজনন ঋতু ও দক্ষিণ পশ্চিম-মৌসুমী বায়ুর আগমনের সঙ্গে এক নিবিড় যোগ আছে। বর্ষার ঠিক আগে কয়েকবার বৃষ্টি না হলে শালিক পাখির প্রজননের কাজ বন্ধ হয়ে থাকে। নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ, বর্ষার আগমন, শত্রুর সম্মুখীন হওয়ার সময় ও অন্যান্য কারণে শালিক নানা ভাবে ডেকে থাকে। এই সব ধ্বনির মধ্যে **কিক, কিকিউ ; কিক, কিকিউ ; কিক কিকিউ ; পিকিউ, পিকিউ, পিকিউ** ধ্বনি সবচেয়ে বলিষ্ঠ ও প্রবলতর। শালিকের উচ্চারিত বিভিন্ন ধ্বনি সম্বন্ধে (call notes) গবেষণাকালে (১৯৬৫) বর্তমান লেখক প্রাকৃতিক দূর্যোগ ও শালিক উচ্চারিত **পিকিউ, পিকিউ, পিকিউ** ধ্বনির মধ্যে এক বিশেষ সম্পর্ক লক্ষ্য করেন। সংগৃহীত তথ্যে দেখা গেছে যে কোন স্থানে ঘূর্ণি ঝড়, বজ্রবিদ্যুৎ, প্রবল ঝড়বৃষ্টি অথবা নিম্নচাপ সৃষ্টির প্রায় ৮—৩৬ ঘণ্টা আগে শালিক **পিকিউ, পিকিউ, পিকিউ** শব্দে ডাকতে থাকে। এই ডাকের একটা নির্দিষ্ট ছন্দ আছে। কুড়ি থেকে তিরিশ সেকেণ্ড ব্যাপি **পিকিউ, পিকিউ, পিকিউ** ডাকার পর শালিক দশ থেকে পনের সেকেণ্ড নীরব থাকে। তারপর আবার ঐ ডাক আরম্ভ হয়। যতক্ষণ না সে স্থানে প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটছে বা তার সম্ভাবনা দূর হচ্ছে তত-ক্ষণ শালিক পাখি ঐ ভাবে সংকেত জানাতে থাকবে। আবহাওয়া পরিবর্তনের প্রবলতার সঙ্গে শালিকের **পিকিউ, পিকিউ, পিকিউ** ডাক ব্যাপক ও গভীরতর হয়। পরবর্তীকালে শালিক পাখির আবহাওয়া পরিবর্তনের পূর্বাভাস জানাবার ক্ষমতা নিয়ে সব রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা সফল হয়েছে।

কিন্তু এখন পর্যন্ত এ তথ্য জানা সম্ভব হয় নি যে শালিক পাখি কি ভাবে ও শরীরের কোন তন্ত্রের সাহায্যে আবহাওয়ার পূর্বাভাস জানাতে সক্ষম হয়।

সংগৃহীত তথ্য থেকে অনুমান করা হয়েছে যে পায়ে ও শরীরের অন্যত্র ছড়িয়ে থাকা Herbert's corpuscles-এর সাহায্যে শালিক পাখি বায়ুর চাপের পরিবর্তন ও কাছের বা দূরের শব্দ তরঙ্গের তারতম্য অনুভব করে আসন্ন আবহাওয়া পরিবর্তনের সংকেত ঐ **পিকিউ, পিকিউ, পিকিউ** ডাকের মাধ্যমে প্রকাশ করে।

এ ছাড়া অন্য কয়েকটি প্রজাতির পাখি ভূমিকম্পের আগাম খবর দিতে পারে বলে জানা গেছে। ডরষ্ট (১৯৭৪) মনে করেন যে ঐ Herbert's corpuscles-এর সাহায্যেই পাখি ভূনিম্নস্থ স্তরে মাটির প্রাথমিক কম্পন অনুভব করতে পারে। তাছাড়া কয়লা খনি থেকে বিষাক্ত মিথেন গ্যাস বার হলে বিভিন্ন পাখি নির্দিষ্ট শব্দে বিপদ সংকেত জানায়। তাই কয়লা খনির কাছে খাঁচায়ভর্তি পাখি রাখার রীতি আজও অনেক স্থানে বজায় আছে। কথিত আছে যে হাঁসের বিপদসূচক ডাক শুনে রোমের মানুষ বহুবার নানা বিপদ থেকে নিজেদের রক্ষা করেছেন।

কয়েকটি পরীক্ষার দ্বারা দেখা গেছে যে শবক ফেজান্ট তার নাকের বিশেষ এক অনুভূতির সাহায্যে বাতাসে আর্দ্রতার তারতম্য বুঝতে পারে। টিউবনোজ পাখিদের নাকের ভিতরে যে পর্দা আছে তার দুদিকে দুটি ত্রিকোণ আকারের ভাল্ব লেগে থাকে। এই ভাল্ব দুটি শুধু বাইরের দিকে খোলে। ওড়ার সময় বাতাসে নাকের গর্ত ভরে গেলে ঐ পর্দা ও ভাল্বে চাপ পড়ে। নাকের ভিতর বাতাসের চাপের তীব্রতা ওড়ার সময় পাখির গতি ও বায়ুর গতির উপর নির্ভর করে। পরীক্ষায় দেখা গেছে যে ঐ ভাল্ব ও পর্দা প্রেসার গেজ হিসাবে কাজ করে।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের অনেক আগে পাখি ছাড়াও অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে যে সব অস্বাভাবিক আচরণ ঘটে তার কিছু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা বলা হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

১৯৬৮ সালের এক আলোক উজ্জ্বল সকালে মধু সংগ্রহকারী একদল মানুষ সুন্দরবনের কোরাপুর জঙ্গলে ঢুকে পড়ে। মধু সংগ্রহ করতে যারা জঙ্গলে যায় তারা মৌমাছিদের চাকে ফেরার পথ ধরেই মৌচাকের খোঁজ পায়। সেদিন কিন্তু তারা জঙ্গলের কোথাও কোনো মৌমাছি দেখতে পেলো না। এই অস্বাভাবিক ঘটনায় মধুসংগ্রহকারীর দল খুব অবাক হয়ে গেলো। যাই হোক অনেক পথ পার হয়ে তারা একটা মৌচাকের সন্ধান পেল। কিন্তু

বিস্ময়ের সঙ্গে তারা দেখলো যে হাজার হাজার মৌমাছি চাককে ঘিরে আর্তনাদ করছে। এ দৃশ্য আগে তারা কখনো দেখেনি। এ দৃশ্যে ওরা ভয় পেয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরতে আরম্ভ করে এবং প্রায় তিনটের সময় মধুসংগ্রহকারীরা নদীর তীরে আসে। ইতিমধ্যে ঘন মেঘে সমস্ত আকাশ ঢেকে গেছে। ওদের নৌকা গ্রামের পথে যাত্রা করার আগেই মুষল ধারায় বৃষ্টি নামে এবং তা চলে প্রায় দু-ঘণ্টা।

১৯৭৮ সালে সেপ্টেম্বরের কোনো এক দিনে সকাল বেলায় সূর্যের যে দ্যুতি ছড়িয়ে পড়েছিল তা দেখে কোনো বিপদের কথা কারও মনে আসেনি। বেলা দুটোর সময় একটা কেউটে সাপকে খুব তাড়াতাড়ি একটা শিরিষ গাছে উঠতে দেখা গেলো। কয়েক মিনিটের মধ্যে একটা সমান্তরাল ডালকে জড়িয়ে সাপটা প্রায় নিশ্চল হয়ে পড়লো। সেদিন সন্ধ্যের সময় প্রচণ্ড বৃষ্টি আরম্ভ হয় এবং তা চলে দুদিন ধরে। বৃষ্টির জলে নদী উপছে পড়ল এবং সমস্ত দ্বীপটা জলে ডুবে গেলো। এর ন-দিন পরে দ্বীপ থেকে জল সরে যেতে আরম্ভ করে। আরও দু-দিন পরে সাপটা গাছ থেকে নেমে জঙ্গলে ঢুকে গেলো।

সুন্দরবনের মরিচঝাঁপি দ্বীপ হরিণ, শূয়োর বাঘ ও অন্যান্য প্রাণী প্রাচুর্যের জন্য প্রসিদ্ধ। ১৯৭৯ সালের একটি দিনে ঐ দ্বীপের ঝিলা ব্লক অঞ্চলে কতকগুলি হরিণকে একটু উঁচু জায়গায় স্থির হয়ে থাকতে দেখা যায়। তাদের কাছাকাছি মানুষের যাতায়াত সত্ত্বেও হরিণগুলি পালিয়ে গেলো না। হরিণের এ আচরণ অস্বাভাবিক। বিকেল প্রায় তিনটের সময় ওখানকার নদীতে জলোচ্ছ্বাস দেখা যায়। কিছুক্ষণের মধ্যে ঐ উঁচু জায়গাটা ছাড়া ঐ অঞ্চলটি জলে ডুবে যায়। হরিণগুলি ঐ জায়গায় তখনও নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো।

অতএব এসব ঘটনা থেকে বলা যায় যে পাখি ও অন্যান্য প্রাণী প্রাকৃতিক দুর্যোগের পূর্বাভাস জানতে সক্ষম। কাজেই আমরা যদি পাখি ও অন্যান্য প্রাণীর বিপদসূচক ডাক ও আচরণ সম্যক উপলব্ধি করে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের খবর আগাম জানতে পারি তবে সহস্র সহস্র প্রাণ ও ধন-সম্পত্তি রক্ষা করা সম্ভব হতে পারে। সুতরাং এ ব্যাপারে ব্যাপক গবেষণা অত্যন্ত প্রয়োজন।

২। সংবাদ সরবরাহে পাখি

সভ্যতা বিকাশের কোন্ লগ্নে সংবাদ্ আদান-প্রদানের জন্য মানুষ পাখির সাহায্য গ্রহণ করতে আরম্ভ করে তার হদিশ আজ আর সঠিক ভাবে পাওয়া

যায় না। তবে নির্ভরযোগ্য কিছু তথ্য থেকে জানা গেছে যে পাঁচ হাজার বছর আগে মিশরের অধিবাসীরা খাগ্য ও সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য পায়রা পালন করতে আরম্ভ করে। বহু প্রাচীন ভারতীয় কাহিনীতে দেখা যায় যে সে-সময় প্রেমিক-প্রেমিকারা পায়রাকে দিয়ে নিজেদের মধ্যে চিঠি দেওয়া-নেওয়া করতো। কথিত আছে যে রাজা সলোমন কেরিয়ার পায়রার সাহায্যে তার রাণীর সঙ্গে পত্র বিনিময় করতেন। জুলিয়াস সিজার রাজ্য পরিচালনার সমস্ত গুপ্ত কাজে পায়রার সাহায্যে খবর সংগ্রহ করতেন। ডাইওক্লিটিয়ান একটি আলাদা ডাক ব্যবস্থা প্রচলন করে পায়রাকে দিয়ে চিঠি পাঠাতেন। ইরাকের শাসনকর্তারা পায়রার সাহায্য নিয়ে তাদের বিশাল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন শহরের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখার বন্দোবস্ত করতেন। রাজা চতুর্থ হেনরী ১৪৫০ সালে প্যারিস অবরোধ করেন। ঐ সময়ে ফরাসি শাসনকর্তা দেশের বিভিন্ন শহরের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করার জন্য পাখিকে কাজে লাগান। ১৮৫০ সালে জুলিয়াস রয়টার সংবাদ সংগ্রহ ও সরবরাহের ব্যবস্থা পত্তন করেন। তিনি Aachen ও Verviers-এর মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য দুটি পায়রাকে নিয়োগ করেছিলেন। ঐ দুটি পায়রা পণ্যদ্রব্য, আর্থিক ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত সমস্ত খবর যোগাড় করতো। ১৮৭১ সালে ফ্রান্স ও প্রুসিয়ার যুদ্ধের সময় সামরিক বাহিনীর ডাক ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে পায়রার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো। প্যারিসের কোনো একটি প্রবেশ দ্বারে পায়রার প্রতীক চিহ্ন আজও অক্ষুণ্ণ আছে।

দূরদেশে যাওয়ার আগে প্রাচীন কালের গ্রীক নাবিকরা সঙ্গে করে পায়রা নিয়ে যেতো। দেশে ফেরার কয়েকদিন আগে তারা ঐ পায়রা উড়িয়ে দিতো। পায়রার দল স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করলে নাবিকদের আত্মীয়-স্বজন বুঝতে পারতেন যে তাদের মানুষ আর কয়েকদিনের মধ্যে ঘরে ফিরবে। বেতার আবিষ্কার হওয়া সত্ত্বেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পায়রার সাহায্যে নিয়মিত খবর সংগ্রহ করা হতো। প্রকৃতপক্ষে উপকূল রক্ষার জন্য নিয়োজিত প্রতিটি মারকিন বিমানে দু-টি করে পায়রা রাখা হতো। বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হলে অথবা বিমান ভেঙ্গে গেলে ঐ দু-টি পায়রাকে ছেড়ে দেওয়া হতো এবং তারা নির্দিষ্ট স্থানে সেই বিপদের খবর পৌঁছে দিত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে একটা ছোটো পায়রা এমন একটা গোপন খবর মিত্র পক্ষের কাছে পৌঁছে দেয় যে তার ফলে হিটলারের পরাজয়

অবশ্যম্ভাবি হয়ে পড়ে। ১৯৪৩ সালে ঐ পায়রাটিকে 'ভি'কেন মেডেল' প্রদান করে সম্মানিত করা হয়।

কৃষ্ণনগর রাজবাড়ির দুর্গা প্রতিমা, রাজরাজেশ্বরীকে জলঙ্গী নদীতে বিসর্জন দেওয়া হয়। প্রতিমা মাঝ নদীতে নির্মজ্জিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দু-টি নীলকণ্ঠ পাখি উড়িয়ে দেওয়া হয়। পাখি দু-টি রাজবাড়িতে তাদের নির্দিষ্ট স্থানে ফিরে এলে অন্দর মহলের সবাই বুঝতে পারে যে, রাজরাজেশ্বরী নির্বিঘ্নে বিসর্জিত হয়েছে। ঐ নীলকণ্ঠ পাখি দু-টি হারিয়ে যাওয়ার পর সাদা পায়রা উড়িয়ে দিয়ে বিসর্জনের খবর রাজবাড়িতে পাঠানো হচ্ছে।

বিখ্যাত ব্যবসায়ী Naltan Roths-child নেপোলিয়ানের সঙ্গে যুদ্ধ চলাকালে প্রতিদিনের যুদ্ধের খবর পায়রার সাহায্যে সংগ্রহ করতেন। এই ভাবে আগে থেকে যুদ্ধের খবর পেয়ে তিনি Stock Exchange adjust করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উপকূল রক্ষীবাহিনী বিভিন্ন কারণে সমুদ্রে দুর্ঘটনার কবলে পড়া জীবিত মানুষ উদ্ধারের কাজে পায়রার সাহায্য নেওয়ার এক অভিনব প্রকল্প অতি সম্প্রতি চালু করেছে। ঐ রক্ষী বাহিনীর পাহারারত হেলিকপ্টরের তলায় একটি প্লাসটিকের খাঁচা এমন ভাবে লাগানো হয় যাতে তিনটি পায়রা সহজ ভাবে ওখানে থাকতে পারে। পায়রা তিনটিকে ঐ খাঁচায় এমনভাবে রাখা হয় যাতে প্রত্যেকে দিগন্তরেখার বিভিন্ন ১২০° কৌণিক অংশের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। প্রত্যেক পায়রার কাছে একটা যন্ত্রচালিত বোতাম রাখা হয়। পায়রাদের এমন ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় যে তারা সমুদ্রে ভাসমান লাল, হলুদ ও গোলাপী রঙের কোনো বস্তু দেখলেই ঐ বোতামে ঠোকর মারবে। বোতামে ঠোকর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হেলিকপ্টর চালকের কেবিনে একটি শব্দ হয় ও নির্দিষ্ট একটা আলো জলে উঠে। কোন্ পায়রা ঐ নির্দেশ পাঠালো তা জেনে নিয়ে হেলিকপ্টর চালক উদ্ধার কাজের জন্য তখন সেদিকে রওনা হয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

১। মানুষের নৃত্য কল্পনায় পাখির প্রভাব

মানুষের জীবন সত্তায় অন্যান্য কর্মকাণ্ডের মতো নৃত্যেরও প্রয়োজন আছে। নাচ মানুষের জীবনকে অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য সমৃদ্ধ করে। অন্যান্য প্রাণীদের মধ্যে সংঘটিত নাচ কেবলমাত্র পাখিদের মধ্যেই দেখা যায়। মানুষ ও পাখি উভয়ের ক্ষেত্রেই নাচ মানসিক ও শারীরিক উত্তেজনা সৃষ্টি করে তাদের বিহ্বল করে দেয়। কাজেই উভয়ের নাচে বিশেষ রকমের সাদৃশ্য দেখা যায়। বস্তুতঃ মানুষের সমাজে এমন কোনো নৃত্য ভঙ্গিমার আবিষ্কার হয় নি যা কোনো না কোনো পাখির মধ্যে নেই। এই সাদৃশ্য থেকে অনুমান করা হয়েছে যে মানুষ তার বিভিন্ন নৃত্যরূপ পাখির নাচ থেকেই অনুকরণ করেছে। কয়েকটি উদাহরণ থেকেই এর সত্যতা বোঝা যাবে।

সারস পাখির বিভিন্ন নৃত্যরূপের মধ্যে সমবেত যুগল নাচ প্রধান। নাচ আরম্ভের আগে স্ত্রী-সারস এ ব্যাপারে কোনোরকম গরজ দেখায় না। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে ঐ নাচে যোগ দিয়ে নিজেকে নাচের সঙ্গে একীভূত করে ফেলে। পূর্ব-আফ্রিকার ওয়ানডারএনকো (Wanderenko) উপজাতির একটি প্রধান নৃত্য পরিকল্পিত হয়েছে নারীর মন পাওয়ার জন্য বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ দেখানো। সারস পাখির মতো এখানেও মেয়েরা নাচ আরম্ভের সময় এ ব্যাপারে কোনো উৎসাহ দেখায় না। কিন্তু কিছু পরে ঐ নৃত্যে মেয়েরা মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। নিউজিল্যাণ্ডে ছদ্মবেশী পুরুষ নাচিয়ে দলবদ্ধভাবে প্রেয়সীর দিকে একবার এগিয়ে একবার পিছিয়ে যে নাচ করে তা সারস পাখির মধ্যেও দেখা যায়। গাউল্ডস্‌, ম্যানাকিন পাখি যুগলে নাচতে নাচতে একসঙ্গে নিকটবর্তী জঙ্গলে লুকিয়ে পড়ে। এই ধরনের নাচ আমাজনের ইটোগাপুক, রায়ওআপুরা ও ইন্দোচীনের বেশ কিছু উপজাতির মধ্যে দেখা যায়। এরাও যুগলে নাচতে নাচতে জঙ্গলে চলে যায়।

চক্রাকারে সমবেত নাচ অতি প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের মধ্যে প্রচলিত। টারকি হাঁস প্রথমে একটা গাছকে ঘিরে চক্রাকারে নাচতে আরম্ভ করে। ক্রমে একটি একটি করে পাখি এতে যোগ দিয়ে সমবেত ভাবে গাছকে প্রদক্ষিণ করে। এ্যাভোসিট পাখির মধ্যে এই ধরনের নাচ দেখা যায়। একটি বিশেষ নাচের আগে একটি গোলাপী পুরুষ-ষ্টারলিং শরীর নীচে নামিয়ে ধীর পদক্ষেপে ডানা

ও লেজ ক্রমাগত আন্দোলন করতে করতে একটি মেয়ে স্টারলিংকে প্রদক্ষিণ করতে আরম্ভ করে। ঐ সময়ে পুরুষ পাখিটি অত্যন্ত উঁচু স্বরে গানও গাইতে থাকে। প্রথমে মেয়ে পাখিটি নিস্পৃহতা দেখায়, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে নাচে যোগ দিয়ে যুগলে চক্রাকারে ঘুরতে থাকে। ক্রমশঃ ঘোরার দ্রুততা বাড়ে এবং এইভাবে কিছুক্ষণ নাচের পর মেয়ে স্টারলিং পাখিটি হঠাৎ নাচ বন্ধ করে পুরুষ পাখিকে প্রেমালিঙ্গন করে। মানুষের সমাজে এই ধরনের নাচ বহুল প্রচলিত।

লেসান আলবাট্রস যুগল নাচের সময় স্বজাতীয় পাখির দ্বারা পরিবৃত হয়ে থাকে। ঠিক এই ধরনের নাচ বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে দেখা যায়। স্পেনের মাইওলিথিক যুগের এক গুহায় নৃত্যরত ভঙ্গিমায় নর-নারীর বহুবর্ণখচিত দেওয়াল চিত্র পাওয়া যায়। এই নৃত্য-ভঙ্গিমার উপাদান যে আলবাট্রস পাখির নাচ থেকে অনুকরণ করা হয়েছে তা ঐ দেওয়াল চিত্র দেখে বেশ বোঝা যায়। এই নৃত্য দৃশ্যে অতীত ইতিহাসের কিছু ইঙ্গিত আছে। যেমন গুহার ঐ দেওয়াল চিত্রে একজন নগ্ন-পুরুষকে অত্যন্ত উত্তেজিত অবস্থায় নয়টি নারী পরিবৃত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। এইদৃশ্য কৃষ্ণকে ঘিরে নয়জন রাখাল বালিকার এবং প্রেমের দেবতা অ্যাপেলোকে ঘিরে নয়জন পরীর নৃত্যদৃশ্যকে স্মরণ করায়। বর্তমান কালে আফ্রিকার বুসম্যান উপজাতির রমণীরা একজন পুরুষকে ঘিরে নেচে থাকে। Wanyamwezi উপজাতির মধ্যে মেয়ের বিয়ের সময় একটি বিশেষ ধরনের নাচ প্রচলিত আছে। বর মেয়ের বাড়িতে এসে পৌছলে মেয়েরা বরকে ঘিরে নাচতে আরম্ভ করে। এই নাচই ওই উপজাতির বিয়ের প্রধান অঙ্গ।

এছাড়া নানা ভঙ্গিমায় সমবেত নাচ ম্যানাকিন, হাঁস প্রভৃতি পাখির মধ্যে বহুল প্রচলিত। নানা ভঙ্গিমায় সমবেত নাচ বা ব্যালে নাচ উপজাতি ও সভ্য সমাজের সর্বত্রই প্রচলিত। ক্যারোলীন দ্বীপের মেয়েরা হাত-পায়ে ও মুখে রঙ মেখে সমবেত নাচে যোগ দেয়। গাউল্ডস, ম্যানাকিন ও তিতির পাখি নাচের সময় একজন আর একজনের সঙ্গে স্থান পরিবর্তন করে থাকে—যা মানুষের মধ্যেও প্রচলিত।

যৌন নাচ

আনন্দ নৃত্য বা যৌন নৃত্য মানুষ ও পাখির মধ্যে সমভাবে প্রচলিত। উভয় ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে এই নাচে অংশগ্রহণকারী মানুষ ও পাখি নাচতে নাচতে

বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে পড়ে। Bacchus ও Cybele-এর নর্তকীরা যৌন নাচের সময় প্রায় পাগলের মতো হয়ে যায় এবং ইন্দোচীনের নর্তকীরা ধ্যানস্থ হয়ে পড়ে। ঠিক এইভাবে প্রেম-নাচের সময় গ্রায়ুজ পাখি এমন অচৈতন্য হয় যে সহজেই তখন তারা নেকড়ের কবলে পড়ে। নাচের সময় অচৈতন্য হওয়ার ফলে অনেক বুসম্যান উপজাতীয় নর-নারী ঐ সময় শত্রুর দ্বারা নিহত হয়।

Jivaro Indians-রা যৌন নাচের সময় কক-অফ-দি-রক পাখির নাচ নকল করে এবং নাচের সময় মেয়েরা গান গাইতে থাকে—

"Being the wife of the cock-of-the-rock
Being the wife of the little Sumga.
I jockingly sing to you thus:
Cock-of-the-rock my little husband,
Wearing your many-coloured dress of feathers,
Graceful in your movements!
I know I am useless myself
But still rejoy
For I am the wife of the Sumga—
So I am jockingly sing."

সাইবেরিয়ার Chukchee উপজাতি পাখির প্রেমজ ব্যবহার অনুকরণে নানা অঙ্গভঙ্গি সহকারে নেচে থাকে। নিউগিনির মনুমবু উপজাতি ক্যাস্যুয়ারি; অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীরা এমু; নিউ আয়ারল্যাণ্ড-এর অধিবাসীরা ধনেশ; এবং আমেরিকার মাইডু উপজাতি ট্রী-ক্রিপার পাখির নাচ অনুকরণ করে নাচে। ব্রাজিলের Kobeua ও Kana উপজাতির নর্তক ও নর্তকীরা 'মুখোস' নাচের সময় পেঁচা, ভাল্লুক প্রভৃতি পাখির নাচ অনুকরণ করে। আধুনিক ইউরোপীয় নাচেও পাখির অনুকরণে বহু নাচ পরিকল্পনার উদাহরণ মেলে। জার্মানীর বিখ্যাত Schuhplattlr নাচে যে ভঙ্গিমা ব্যবহার করা হয় তা Teraomidae প্রজাতির পাখির নাচ থেকে অনুকরণ করা হয়েছে।

প্রেমিকার সামনে নিউগিনির প্রেমিকের যৌন নৃত্য এবং ফেজান্ট ও ওয়ারবলার পাখির যৌন নৃত্যের উদ্দেশ্য একই—প্রেমিকার মন পাওয়ার জন্য প্রচেষ্টা। আবার মেয়ে রেড-নেকেড, ফ্যোলারোপ ও পেইনটেড পাখি প্রেমিকের সামনে নানা ভঙ্গিমায় নেচে তার মন জয় করার চেষ্টা করে। ঠিক

এই কারণেই Minnetarce-এর কুমারী মেয়ে তার প্রেমিকের সামনে ব্যাকুল-ভাবে নাচতে থাকে।

ভয়ে বা পরাজিত হলে পাখি অনেক সময় নেচে উঠে যা আমরা কিছু মানুষের মধ্যেও দেখি। তাছাড়া অনেক উপজাতির মধ্যে মৃত ব্যক্তির সামনে নাচ করারও প্রচলন আছে।

চরম মানসিক উত্তেজনাই পাখি ও মানুষের মধ্যে নাচের প্রেরণা জাগায়। নাচের ছন্দ ও আবেগে মানুষ ও পাখি একইভাবে অভিভূত হয়। পাখি ও মানুষের নাচের মধ্যে এই সামগ্রিক মিলন প্রমাণ করিয়ে দেয় যে উভয়ের মানসিক বিবর্তন একই ধারায় প্রবাহিত হয়েছে।

২। সামাজিক আচার অনুষ্ঠানে পাখি

সুদূর কোন্ অতীতে পাখি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে ওতোপ্রতো ভাবে জড়িয়ে পড়েছিলো তা এখন এক অজানা অধ্যায়। যেসব নিদর্শন পাওয়া গেছে তার থেকে বলা যায় যে প্রস্তর যুগেই মানুষ অন্যান্য প্রাণীর থেকে পাখির প্রতি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হয় এবং অনেক দেশে পাখিকে ঘিরে মানুষের ধর্মীয় আচার ব্যবহার নির্দিষ্ট হয়েছে।

প্রাচীন কাল থেকেই মানুষের নানা সামাজিক অনুষ্ঠানে পাখির ডাক ও আচরণ অনুকরণ করা অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করা হতো। অনুকরণ করার এই ক্ষমতাকে শামিনিষ্টিক সভ্যতার মানুষ অত্যন্ত মূল্য দিত। কীরঘিজ—তাতারশামিনরা নানা অলৌকিক উপায়ে মানুষের রোগ-শোক, জরা-ব্যাধি দূর করতে পারে বলে মনে করা হতো। এই শামিন গোষ্ঠী অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে বিভিন্ন পাখির ডাক অনুকরণ করতো। ঐ অনুকরণের দক্ষতাই তাদের এনে দিতো জরা-ব্যাধি থেকে মানুষকে মুক্ত করার ক্ষমতা। মানুষের রোগ-মুক্তির জন্য যে সব ক্রিয়া-কলাপের প্রচলন ছিল তাতে সব দেশের শামিনরাই ঈগল, পেঁচা ও অন্যান্য পাখির সাজে সজ্জিত হয়ে ঐ সব অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করতো। এছাড়াও 'শামিন সভ্যতার' সময় জনন-ধর্মী অনুষ্ঠানেরও বহুল প্রচলন ছিল। সেই সময় শামিনরা বাড়ি বাড়ি ঘুরে মুরগীর ডাক ডেকে শুনিয়ে আসতো। এর পরেই গৃহে শিশুর আগমন সুনিশ্চিত হতো বলে তখনকার মানুষ মনে করতো। এসব ছাড়াও মানুষ পাখির বহু আচরণ নিজেদের জীবনে অনুকরণ করেছে। অনুমান করা হয় যে পাখির লেক ডিসপ্লে [Lek display]

(অর্থাৎ একটি স্থানে অনেকের পূর্বরাগ পর্ব) দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে রসিক শিল্পী SCHWHPLATTLE নাচের প্রবর্তন করেন। সালভেনিয়া গ্রামের মুখোস পরা শিল্পীরা আজও পাখির পোশাকে সজ্জিত হয়ে SHROVE-TIDE-এর [ধর্মীয় উপবাস কালে] দিনে গান গেয়ে অর্থ উপার্জন করে।

বসন্তকালে প্রথম যেদিন কোকিল কুহু কুহু ডাক ডেকে উঠে সেই দিন ইউরোপের বহু মানুষ মুদ্রা ক্ষেপন করে নিজের ভাগ্য পরীক্ষা করে। আয়ারল্যাণ্ডের মানুষ বিশ্বাস করে যে র‍্যাভেন পাখি সত্য কথা বলে। তাই কোনো কিছু অঙ্গীকার বা প্রতিজ্ঞা করার সময় র‍্যাভেনের ডাক শোনা গেলে তার যথার্থতা প্রমাণ হয় বলে আয়ারল্যাণ্ডের মানুষ আজও বিশ্বাস করে।

পাখি নানা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী এ বিশ্বাস যেমন প্রাচীন যুগে ছিল আজও তেমন আছে। প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যে সৈনিকরা যুদ্ধে যাবার আগে উৎসর্গীকৃত একদল মুরগীকে মন্ত্রপূত যব খেতে দিতো। আগ্রহের সঙ্গে ঐ মুরগীর দল সেই খাদ্য গ্রহণ না করলে তাকে বিপদের পূর্বলক্ষণ বলে রোম সাম্রাজ্যের পুরোহিতরা মনে করতেন। এ ছাড়া মানুষের ধারণা ছিলো যে পাখির ডাকের মধ্য দিয়েই ঈশ্বরের বাণী প্রেরিত হয়। শিল্পোন্নত ব্রিটেনের মানুষ এখনও বিশ্বাস করে যে, র‍্যাভেন, কাক, কোকিল প্রভৃতি পাখি মানুষকে দৈববাণী জানিয়ে থাকে। মহাকবি কালিদাস সকাল বেলায় কাকের 'কা' 'কা' রবকে অভিসারিকাদের জন্য সাবধান বাণী বলে মনে করেছেন। কারণ অভিসারিকারা নিজ নিজ উপপতির ঘরে ঘুমিয়ে থাকে। কাকেরা সকালে 'কা' 'কা' সংকেত দ্বারা রমণীদের জাগিয়ে দিয়ে বলে থাকে যে—সকাল হয়েছে, সূর্য উঠেছে তোমরা এখন নিজের নিজের স্বামীর ঘরে ফিরে যাও। এসব ছাড়াও পাখি অনেক অপার্থিব ক্ষমতার অধিকারি বলে মানুষ মনে করতো। বিশ্বাস করা হতো যে বিভিন্ন পাখি গান গেয়ে শহর তৈরি করে বা ভীষণতম প্রাণীকে বশীভূত করতে পারে। গ্রীক দেশের পৌরাণিক কবি অরফিয়াস লায়ার পাখির সাহায্যে বিভিন্ন প্রাণী ও গাছপালাকে বশীভূত করতেন বলে সেই দেশে কিংবদন্তি প্রচলিত আছে। বহু সমাজে এখনও এ ধারণা বদ্ধমূল যে পাখি মানুষের ভাষা ব্যবহার করে তাকে জীবনের গূঢ় রহস্য সম্বন্ধে জ্ঞান দান করতে পারে।

বর্তমান কালেও পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই বিভিন্ন পাখির ডাক অথবা তাদের নানা ব্যবহারিক লক্ষণগুলি নিজেদের জীবনের ভাল-মন্দের সঙ্গে জড়িয়ে

রেখেছে। যেমন ভারতীয় রমণীরা এক জোড়া শালিক পাখির দেখা পেলে খুব খুশি হয়। কেননা জোড়া শালিককে মেয়েরা স্বর্গীয় প্রেম ও বন্ধনের প্রতীক বলে মনে করেন। এই জন্যই এইদেশের নারী ; প্রৌঢ়া, যুবতী অথবা কিশোরী যেই হোক না কেন এক জোড়া শালিক পাখি দেখলেই গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রণাম জানায়। আবার ইউরোপের অনেক দেশে সকাল বেলায় মুরগীর ডাক শুনলে তাকে প্রেমিক-প্রেমিকার বিচ্ছেদের পূর্বাভাস বলে মনে করে। অন্যদিকে সূর্যাস্তের সময় ভরত পাখির উর্ধাকাশে বিচরণ ইউরোপের মানুষের কাছে আনন্দের প্রতীক হিসাবে গণ্য হয়। এশিয়া মহাদেশের মানুষ ঘুঘু পাখির ডাককে আনন্দের ঝরণা বলে মনে করে।

ভারতবর্ষে বৈদিক যুগ থেকে আরম্ভ করে এখনও মানুষ পাখির নাম অনুসারে নবজাত শিশুর নামকরণ করে। এ রীতি পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই প্রচলিত। পাখির প্রতি মানুষের এক বিশেষ আকর্ষণই এইরূপ নামকরণের কারণ।

৩। মানুষের আনন্দ বিনোদনে পাখি

অতি প্রাচীনকাল থেকেই রাজা-মহারাজা ও সাধারণ মানুষ আনন্দ বিনোদনের জন্য নানাভাবে পাখিকে ব্যবহার করেছে। আজও সে ধারা অক্ষুণ্ণ রয়েছে। ইতিহাসে দেখা যায় যে পায়রা-দৌড় প্রতিযোগিতা। প্রাচীন কালের আভিজাত মানুষের খেলাধুলার প্রধান অঙ্গ ছিল। পরবর্তীকালে এই জিনিস প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। আবার ১৮৯৬ সালে ফ্রান্সের National Homing Union পায়রা-দৌড় পুনরায় চালু করে। এই রকম একটা প্রতিযোগিতা THURPO থেকে LONDON পর্যন্ত ৫১০ মাইল পথ বিস্তৃত ছিল। মাত্র ১০ ঘণ্টায় সেই পথ অতিক্রম করে প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী পায়রা মানুষকে চমকে দিয়েছিল। এখনও পর্যন্ত পৃথিবীর বহুদেশে দ্রুতগামী ট্রেন এত অল্প সময়ে এই দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে না। ভারত স্বাধীন হওয়ার আগে বেশ কিছু ইংরেজ মানুষ Igatpori ও Bangalore-এর মধ্যে নিয়মিত পায়রা-দৌড় প্রতিযোগিতার প্রচলন করেন। ভারত স্বাধীন হবার পর Karnataka Racing Pigeon Association ১৯৭৩ সাল থেকে আবার পায়রা-দৌড় প্রতিযোগিতা আরম্ভ করেন। এই সময়ের একটি প্রতিযোগিতার বিজয়ী পাখি ৪ ঘণ্টা ৩৬ মিঃ ৩০ সেঃ-এ মাদ্রাজ

থেকে ব্যাঙ্গালোর গিয়েছিল। বহু বছর বন্ধ থাকার পর ১৯৫৩ সালে কোলকাতায় আবার পায়রা দৌড় প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী এক-একটি পায়রার দর প্রায় তিন হাজার টাকা। ১৯৬৮ সালে মিঃ ইয়োপের 'ব্রাভো' মাত্র বাইশ ঘণ্টায় দিল্লি থেকে কোলকাতায় ফিরে এসেছিল।

পায়রা ওড়ানো, বুলবুল ও মুরগীর লড়াই দেখা রাজা-মহারাজেদের কাছে আভিজাত্যের প্রতীক বলে গণ্য হতো। আজও বহু মানুষ এই খেলার নেশায় মত্ত হয়ে থাকে। ভারতীয় মুসলমান সম্রাটদের মধ্যে আলাউদ্দিন খিলজি, ফিরোজ তোঘলুক, আকবর, জাহাঙ্গীর ও বাহাদুর শা আনন্দ ও খেলার জন্য পায়রা পুষতেন। জানা যায় যে আকবরের পাখিরালয়ে কুড়ি হাজার পায়রা ছিল।

৪। মানুষের জীবন সত্তায় পাখির গান

সৃষ্টির প্রথম থেকেই মানুষ পাখির গান শুনে আনন্দ উপভোগ করেছে। পাখির গান মানুষের জীবনের নিঃসঙ্গতা, দুঃখ ও ব্যাথা ভুলিয়ে তাকে নতুন জীবন আরম্ভের প্রেরণা দেয়। কাজেই পৃথিবীর সমস্ত দেশের সাহিত্য, কিংবদন্তী ও লোককাব্যে পাখির গান নানাভাবে স্থান পেয়েছে। তাছাড়া বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায় যে আদিমতম শিকারী মানুষ প্রায়ই পাখির ডাক ও গান নকল করার চেষ্টা করতো। এবং এই প্রচেষ্টার ফলেই হয়তো মানুষের কণ্ঠে সঙ্গীতের সুর প্রথম ধ্বনিত হয়।

নৃতত্ত্ববিদরা মনে করেন যে প্রায় কুড়ি হাজার বছর আগের যে সব সছিদ্র-অস্থির সন্ধান পাওয়া গেছে সেগুলি ঐ যুগের মানুষ বাদ্যযন্ত্র রূপে ব্যবহার করতো। ঐ সব সছিদ্র অস্থি বাজিয়ে যে সব সুরধ্বনি পাওয়া যায় তা অনেক পাখির কণ্ঠস্বরের সঙ্গে মিল আছে। নানা তথ্য থেকে জানা গেছে যে তাম্র-যুগের মানুষ পাখির ডাক নকল করে নানা রকম বাদ্যযন্ত্র বাজাতো এবং তারই সাহায্যে পাখিদের আকর্ষণ করে নিজেদের কাছে নিয়ে আসতো। পরবর্তী কালে অর্থাৎ ১৬৫০ সালে Athanasius kirchen উপজাতি নাইটেঙ্গলের গানের সুর তাদের সঙ্গীতে ব্যবহার করেন। তাছাড়া কোকিল ও তিতার পাখি উচ্চারিত বিভিন্ন শব্দধ্বনি musical notation-এ ব্যবহার করা হয়। এ ছাড়া প্রাচীন জার্মান minnelieder পাখির ডাক থেকেই নকল করা হয়েছে বলে জানা যায়। এরপর বহু সুরকার বিভিন্ন সময়ে পাখির গানের সুর ও ছন্দ

মানুষের সঙ্গীতে ব্যবহার করেছেন। তারই বিভিন্ন নিদর্শন পাওয়া যায় Catalogue d'oiseaux of Messiaen য়ে।

পাখির গান কি ভাবে মানুষকে উদ্বেলিত করে তার দু-একটি নিদর্শন দেওয়া যেতে পারে :

কবি শেলী ভরত পাখির গান শুনে তাকে দেবদূত বলে মনে করেছেন। দূর আকাশে বিলীয়মান ভরতপাখি তার সুমিষ্ট কণ্ঠ সঙ্গীত বৃষ্টির ধারার মতো পৃথিবীর বুকে ঢেলে চলে—

"Higher still and higher
From the earth thou springest
Like a cloud of fire ;
The blue deep though wingest
And singing still dost soar and soaring ever singest."

সেক্সপীয়র নাইটেঙ্গেলের গানে মুগ্ধ হয়ে বলে ওঠেন—

"It was the nightingle and
not the lark
That pierced the fearful
hollow of thine ear
Nightly she sings on yond
pomegranate tree."

সূর্য উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে উর্ধ্বাকাশে থেকে চাতক পাখির অমৃত-সম গান শুনে কবি মানকুমারী উদ্বেল হয়ে ঐ পাখিকে জিজ্ঞাসা করছেন—তুমি এ গান কোথায় শিখলে ?

"সরিছে আঁধার কালো,
উষার নবীন আলো
দেখাইয়াছে জগতের আধ-আধ ছবি ;
এত ভোরে, কোন পাখী !
গাহিছে আকাশে থাকি,
জাগাইয়া ধরাতল মাতাইয়া কবি ?
"চিনেছি চিনেছি আমি
ওই যে চাতক তুমি,

প্রভাতী কিরণ মেঘে কর ঝলমল ;
নাচিছ তপন আগে,
জাগাইয়া জীব ভাসে
স্থললিত গানে ভরি মাতায়ে ভূতল !"
"শুনি ও অমৃত-গীতি
কার না জনমে প্রীতি ?
কে যেন অমৃতধারা ঢালিছে ধরায়,
ছুটিছে অমৃতরাশি,
অমৃত-হিল্লোল ভাসি,
অমৃত-তুফানে যেন মন ভেসে যায়।"
হেন গান কোথা ছিল ?
কে তোমারে শিখাইল ?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

১। দেবতার রূপকল্পে পাখির আরাধনা

দেহাতীত আত্মার অস্তিত্ব মানুষের প্রাচীনতম বিশ্বাস এবং এই ধারণার জন্যই মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে নিজেকে একীভূত করতে পেরেছে। প্রাচীন তথ্য থেকে জানা যায় যে মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দিয়ে স্বর্গীয় আনন্দ লাভ করেছে। এবং এই নৈসর্গিক ভাব মানুষের ভয়, বিস্ময়, আনন্দ সব একাকার করে দিয়ে অলৌকিকতার দ্বার খুলে দেয়। এইরকম মানসিক অবস্থাতেই গাছ-পালা, নদ-নদী, পশু-পাখি প্রভৃতি সবরকম প্রাকৃতিক বস্তুকেই মানুষ দেবতা বলে পূজো করতে আরম্ভ করেছিল। সভ্যতার আদি যুগ থেকে মানুষ তাই অন্যান্যের মধ্যে পাখিকেও দেবতা বলে কল্পনা করে পূজো করতে আরম্ভ করে।

স্বর্ণ ডানাযুক্ত তিব্বতের পৌরাণিক ঈগল পাখি গরুড় সম্ভবতঃ প্রাচীনতম পাখি যাকে মানুষ দেবতারূপে গ্রহণ করে। এই পাখিকে মানুষ "জীবনের পাখি", সৃষ্টি ও ধ্বংসের প্রতীক বলে মনে করে। হিটিটাইস ও ব্যাবিলনের অধিবাসীরা তাদের দেশে ঈগল পাখির অনেক মন্দির গড়ে তুলেছিল। ঐসময় মিশরীয়রা ফ্যালকন হোরাসকে শক্তির প্রতীক মনে করে পূজো করতো। প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে এথেন্সবাসীরা পেঁচাকে জ্ঞানের দেবতা মনে করে পূজো করেছে। তখন পেঁচাকে "জ্ঞানী বৃদ্ধ পেঁচা" নামে অভিহিত করা হতো। ঋক্‌বেদে পেঁচা মৃত্যুর প্রতীক হিসাবে গণ্য হয়েছে। আর মেসোপটেমিয়ায় দুর্ভাগ্যের দেবী লিলিথের বাহন রূপে পেঁচাও পূজো পেয়েছে। কিন্তু মিশরীয় পুরাণে পেঁচাকে অপদেবতার বাহন ও আরবদেশে ক্রন্দনরত মাতার আত্মার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। আবার আমাদের দেশে সদা-চঞ্চলা ধনদাত্রী লক্ষ্মীদেবীর বাহনরূপে দেবীর সাথে সেও পূজিত হয়।

ভূমধ্যসাগরীয় তীরবর্তী প্রায় সব, দেশেই মাতৃদেবীর রূপকল্পে ঘুঘু পাখি স্থান পেয়ে এসেছে। আর বৌদ্ধধর্মে কামের প্রতীকরূপে ঘুঘু স্থান পেয়েছে। ভারতবর্ষে ঘুঘু পাখি মৃত্যুর দূত হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। যেমন ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে ঘুঘু পাখিকে যমতীর্থ নামে অভিহিত করা হয়েছে। কিন্তু মধ্য প্রাচ্যে ঘুঘু পাখি প্রেমের প্রতীক হিসাবে সেই প্রাচীনকাল থেকে পূজা পেয়ে আসছে। হিব্রু প্রেমিক তাই তার প্রিয়তমার উদ্দেশ্যে আহ্বান জানাচ্ছে—

"Rise up, my love, my fair one, and come away
For lo, the winter is past, the rain is over and gone.
The flowers appear on earth ; the time of
The singing of birds is come, and the voice of the turtle
is heard in our land."

ভারতীয় পুরাণে ময়ূরকে সূর্য দেবতা বলে কল্পনা করা হয়েছে এবং মৎস্য ও অগ্নিপুরাণে মাতৃদেবীকে ময়ূর-বাহিনী বলে বর্ণনা করা হয়। বর্তমান কালে গণ্ড ও বাহার উপজাতি ময়ূরকে মৃত্তিকাদেবী রূপে পূজো করে।

প্রাচীনকাল থেকেই হাঁস ব্রহ্মার বাহন রূপে পূজো পেয়ে আসছে। আবার অন্যত্র বরুণাদেবীর সঙ্গে হাঁসকে চিহ্নিত করা হয়েছে। কোথাও বিষ্ণুর বাহন হিসাবে হাঁসও পূজো পাচ্ছে। প্রেমের প্রতীক হিসাবে অনেক জায়গায় হাঁসকে কুবেরের সঙ্গে যুক্ত করে পূজো করা হয়। তাছাড়া মুক্তির প্রতীকরূপে মহাপুরুষদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে হাঁসও পূজিত হয়ে থাকে। বর্তমান কালে সান্তাল উপজাতি তাদের সবরকম মঙ্গল কাজে হাঁস চিহ্ন ব্যবহার করে। পরবর্তীকালে হিন্দুশাস্ত্রে জ্ঞানের আরাধ্য দেবী সরস্বতীর বাহন হয়ে হাঁস স্থান পায়। এবং বাণী-বন্দনার সময় ঐ মরালও পূজো পায়।

"নির্দেশ"তে কাককে দেবতা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অন্যত্র আবার এও কল্পনা করা হয় যে যম কথন কথন কাকের রূপ ধারণ করে। তাই কাক অশুভর প্রতীক। এছাড়া শকুনিকে অশুভের দেবতা শনির বাহন ভেবে এদেশে কিছু মানুষ পূজো করে।

২। কাব্য-সাহিত্যে পাখি

(ক) ভারতবর্ষে আর্যদের আগমন ও বৈদিক সাহিত্যের সূচনার সঙ্গেই প্রাগ-ঐতিহাসিক যুগ ভারতীয় ইতিহাসে রূপান্তরিত হয়। বৈদিকযুগে মানুষের কাছে প্রাণী জগতের আলাদা কোন সত্তা ছিল না। মানুষ সমেত পৃথিবীর সমস্ত জৈব ও অজৈব পদার্থ নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে তারা মনে করতেন। কাজেই পাখি সমেত অন্যান্য প্রাণী বৈদিক সাহিত্যে নানাভাবে স্থান পেয়েছে।

যজুর্বেদ ও অথর্ব বেদে দেখা যায় যে ঐ যুগের মানুষ বিভিন্ন পাখির ইকলজি ও আচার-আচরণ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করতেন।

কোকিল যে অন্য পাখির নীড়ে ডিম পাড়ে তা বৈদিক যুগে অজানা ছিল না। সমহিতায় বলা হয়েছে যে কোকিল anya-vapa [অন্য ভাপা] যার অর্থ অপরের জন্য বপন করা (ডিম পাড়া)। আর কোকিলের অন্য আর একটি নামও দেওয়া হয়েছে—পরাভৃৎ, অর্থাৎ পরজীবী। এছাড়া অনেক পাখিকে সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যের দূত রূপে অভিহিত করা হয়েছে। অন্যান্য পাখির মধ্যে চড়াই, ময়না, টিয়া, হাঁস, পায়রা, ঈগল, শকুন, পেঁচা ও বক প্রভৃতি বৈদিক সাহিত্যের প্রায় সর্বত্র জড়িয়ে আছে।

ভারতের দুই আদি মহাকাব্য—রামায়ণ ও মহাভারতে নানাভাবে পাখির উল্লেখ পাওয়া যায়। রামায়ণে বর্ণিত পাখির মধ্যে কারণ্ডব বা কুট ; কুড়ারি (উৎক্রোশ) বা অসপ্রে ; চক্রবাক হাঁস ; হট্টিম বা ল্যাপডহংগ ; শকুন ; ময়ূর, ঈগল এবং পানকৌড়িদের নাম রামায়ণে বিশেষভাবে নানাস্থানে বর্ণিত হয়েছে। মহাভারতেও এইসব পাখির উল্লেখ আছে।

রামায়ণে অরণ্যকাণ্ডে বর্ণিত পৌরাণিক পাখি জটায়ু কিভাবে রাবণের হাত থেকে সীতাকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছিল তা মানুষের অজানা নয়। আবার রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে দেখা যায় যে একসময় রাম ও লক্ষ্মণ নাগপাশে বদ্ধ হয়ে পড়ে। ঠিক তখনই সর্পভূক পাখিরাজ গরুড় সেখানে উপস্থিত হয়ে কিভাবে রাম-লক্ষ্মণকে মুক্ত করলেন তা সকলেরই জানা আছে।

প্রাচীন ভারতের চিকিৎসা-বিজ্ঞানের দুটি প্রসিদ্ধ বই যথা—চরকের সমাহিৎ এবং সুশ্রুতের পাখির জীবন নিয়ে বহু ঘটনার উল্লেখ আছে।

প্রায় তিন হাজার বছর আগে তামিল রাজ্যে সঙ্গম সাহিত্যের সূচনা হয়। গদ্য ও কাব্যে মানুষের জীবনের প্রায় সমস্ত কর্মকাণ্ডের সঙ্গে পাখির জীবনকে একীভূত করে বর্ণনা করা হয়েছে।

(খ) বাইবেলে বর্ণিত পাখি

বাইবেলের প্রত্যেকটি বইতেই পাখি নিয়ে নানা আলোচনা করা হয়েছে। জেনেসিস বইতে দেখা যায় যে ঈশ্বর অন্যান্য বস্তুর মতো মাটি থেকে পাখি সৃষ্টি করে মানুষকে তা দান করেছেন। মানুষ যে নামে তাকে ডাকবে ঐ সৃষ্ট বস্তুর নামও তাই হবে—"God created great sea creatures and every sort of fish, and every kind of birds." So the Lord God formed from the soil every kind of animal and bird and

brought them to the man to see what he would call them and whatever he called them that was the name."

অন্যত্র দেখা যায় যে ঈশ্বর মানুষকে পাখি সমেত অন্যান্য প্রাণীর উপর কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা দান করে তাকে বলছেন—তুমি বংশবৃদ্ধি করে পৃথিবী ভরিয়ে দাও এবং তাকে শান্ত কর। তুমি পাখি সমেত অন্যান্য প্রাণীর প্রভু—

"Multiply and fill the earth and subdue it. You are the master of the fish and birds and all animals."

শস্য-সামগ্রী ছাড়াও অন্যান্য প্রাণী সমেত পাখিও মানুষের খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হবে—

"All wild animals and fish will be afraid of you. I have placed them in your power, they are yours to use for food in addition to grain and vegetable."

কিন্তু বেশ কয়েকটি প্রজাতি পাখি যেমন ঈগল, বহেরি বাজ, চিল, ডোমকাক বা র‍্যাভেন, উটপাখি, উৎক্রোশ বা অসপ্রে, পেঁচা, বাজ, সামুদ্রিক গাংচিল, কাস্তে, দোকরা বা আইবিস, পেলিকান, স্টর্ক, পানকৌড়ি প্রভৃতিকে খাওয়া বাইবেলে বারণ করা হয়েছে। গগনভেড় বা শকুন মৃত প্রাণীর হাড় থেকে মজ্জা বার করে খাবার জন্য হাড়গুলি নিয়ে আকাশে উড়ে গিয়ে পাহাড়ের উপর ফেলে দেয়। এই ঘটনার বিশদ বিবরণ বাইবেলে অত্যন্ত নিপুণভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সম্ভবত এই কারণেই শকুনকে মানুষের খাওয়ার অযোগ্য বলে বাইবেলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ঈশ্বরের রূপকল্পে অন্যান্য প্রাণী সমেত পাখির পূজো বাইবেলে নিষিদ্ধ করা হয়েছে—

"Do not defile yourself by trying to make a statue of God—an idol in any form, whether of man, woman, animal or bird."

ঈশ্বরকে অর্ঘ্য নিবেদনের জন্য পাখি উৎসর্গের কথা বাইবেলের অনেক স্থানে পাওয়া যায়। এর জন্য ঘুঘু ও ছোট পায়রাই প্রশস্ত। মানুষের শাস্তি বিধানের জন্য তাদের মৃতদেহ ঈশ্বর পাখিকেই খেতে দেন—

"Your dead bodies will be the food of the birds and no

one will be there to chase them away. I will give dead bodies of your men to the birds and wild beasts."

আবার পাখিও তাদের খাদ্যের জন্য ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। খাদ্য উৎপাদনের জন্য পাখি কোনো কাজই করে না, ঈশ্বরই তাদের খাওয়ান—

"Look at the birds, they do not need to sow or reap or store up food for heavenly Father feeds them."

প্যালেস্টাইনে বিভিন্ন মন্দিরের গায়ে চড়াই পাখি নীড় তৈরি করে। যীশুখৃষ্টের দৃষ্টিও সেদিকে পড়েছিল এবং ঐ চড়াই পাখির কথাও তিনি কয়েকবার বলেছেন—"Not one sparrow falls to the ground without yours Father's knowledge."

তিতির পাখির কথা বাইবেলে অনেক জায়গায় পাওয়া যায়—"As when one doth hunt a partridge in the mountains."

বিভিন্ন পরিযায়ী পাখির অনেক তথ্য বাইবেলের নানাস্থানে পাওয়া যায়। সাদা স্টর্ক প্যালেস্টাইনের অতি পরিচিত একটি পরিযায়ী পাখি। এই পাখি মার্চ-এপ্রিল মাসে জর্ডন উপত্যকার উপর দিয়ে ধীরে ধীরে উড়ে যায়। স্টর্কের এই পথ পরিক্রমার বৃত্তান্ত ও সময়কাল বাইবেলে বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে—

"The storks in the heavens knows the appointed times."

অন্য আর একটি পরিযায়ী পাখি কোয়েল পরযানের সময় হাজারে হাজারে সমস্ত আকাশ আচ্ছন্ন করে মাটির কিছু উপর দিয়ে উড়ে যায়—"At even the quails come up and cover the camps."

(গ) কোরাণ

মুসলিম ধর্মগ্রন্থ কোরাণেও আমরা পাখির বিষয়ে অনেক কথা জানতে পারি। আল্লা একদিন আব্রাহিমকে আদেশ করেন যে সে যেন ময়ূর, ঈগল, ঘুঘু, মুরগী প্রভৃতি পাখিকে এমন শিক্ষা দেয় যাতে ঐসব পাখির নাম ধরে ডাকলেই তার কাছে উড়ে আসতে পারে।

একসময় ইয়েমেনি রাজা বহুসংখ্যক হাতি নিয়ে মক্কা ও কোয়াবা আক্রমণ করেন। কোরাণে দেখা যায় যে মক্কা রক্ষা করার জন্য মক্কাবাসীদের সঙ্গে দলে দলে হাওয়াশীল (swallow) পাখি এসে উপস্থিত হয়। হাওয়াশীল

পাখির দল ছোট ছোট পাথর চঞ্চুতে করে নিয়ে হাতির গায়ে ছুঁড়তে থাকে। এবং এর ফলে হাতি ভয় পেয়ে স্থান পরিত্যাগ করে এবং মক্কা রক্ষা পায়।

কোনো একসময় কোয়াবিল নামে এক ব্যক্তি হাবিলকে হত্যা করে। কিন্তু কোয়াবিল তখন চিন্তায় পড়ে যে সে কি করে ঐ মৃতদেহ সরিয়ে ফেলবে। এমন সময়ে কোয়াবিল দেখতে পায় যে একটি কাক মাটিতে গর্ত খুঁড়ে অন্য আর একটি মৃত কাককে ঐ গর্তে ঢুকিয়ে মাটি, পাতা ও অন্যান্য জিনিস দিয়ে ঢেকে দিচ্ছে। কোয়াবিলও তখন তাই করলো। কোরাণ থেকে জানা যায় যে ঐ সময় থেকেই মানুষের সমাজে মৃতদেহ কবর দেওয়ার রীতি প্রচলিত হয়।

মানুষের খাদ্যের জন্য যেসব পাখির কথা কোরাণে পাওয়া যায় তার মধ্যে Batair (সম্ভবত বটের বা কোয়েল) পাখি অন্যতম।

(ঘ) অনেক কবি ও সাহিত্যিক পাখির গানে উচ্চারিত বিভিন্ন ধ্বনিকে শব্দে রূপান্তরিত করে কবিতায় ব্যবহার করেছেন। যেমন জাপানি কবিতায় Zuri, Wari, Mari প্রভৃতি শব্দ পাখির গান থেকে গ্রহণ করা হয়েছে— Saezuri no takamari owari Shizamarinu.

"The singing of the birds
Louder and Louder, then softer and softer
To silence."

সেক্সপীয়র তার কাব্যে Jug Jug ; tirra lirra ; cuckoo ; tu-witta-woo প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করেছেন যা নাইটিঙ্গেল, স্কাইলার্ক, কুকু প্রভৃতি পাখির ডাক ও গানে শোনা যায়।

মধ্যযুগ থেকে আরম্ভ করে বর্তমান কাল পর্যন্ত বিশ্বের সব সাহিত্যেই পাখির গান ও জীবন নিয়ে নানা বিষয়ে অবতারণা করা হয়েছে। বিভিন্ন জাপানি কাব্যে প্রকৃতি ও পাখির মধ্যে যে নিবিড় সম্বন্ধ দেখানো হয়েছে তার একটি উদাহণ—

"A mountain path ;
Wild geese in the clouds,
The voice of mandarin ducks in the ravine"

"In the leafy tree-tops
Of the summer mountain
The cuckoo calls—
Oh, how far off his echoing voice"

Chinese Book of Ritual-এ মানুষ যে পাখির গান অনুকরণ করে তা নানাভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে :

"To call birds a single change of melody is necessary.
Thus rapport is established with the spirit of the
mountains and the forests."

মহাকবি দান্তে বিভিন্ন পাখির গান ও ডাককে স্বর্গ ও নরকের সঙ্গে তুলনা করেছেন। যেমন নরকের গৃহহারা আত্মার সঙ্গে সারস পাখির তুলনা :

"And as the cranes in long lines streak the sky
And in procession chant their mournfull call,
So I saw come with sound of wailing by
The shadows fluttering in the tempest brawl."

পরে কবি স্বর্গে আত্মার শান্তির কথা বলার সময় ভরত পাখির গানের সঙ্গে তুলনা না করে নিস্তব্ধতার তুলনা করেছেন –

"Like the small lark who wantons free in the air,
First singing and then silent, as possessed
By the last sweetness that contenteth her."

কবি কীটস দুঃখ-বেদনায় ক্ষত-বিক্ষত। তাই তিনি কল্পনায় এমন কোনো শান্তিময় স্থানে যেতে চান যেখানে জগতের দুঃখ বেদনা তাকে স্পর্শ করবে না। ছায়াশীতল অরণ্যের কোল থেকে ভেসে আসা নাইটিঙ্গেল পাখির সুমধুর স্বর তার কাছে নিয়ে এসেছে সেই কল্পলোকের বার্তা—

"Thou wast not born for death, immortal Bird !
No hungry generations tread thee down ;

The voice I hear this passing night was heard
In ancient days by emperor and clown :
Perhaps the self-same song that found a path
Through the sad heart of Ruth, when, sick for home,
She stood in tears amid the alien corn ;
The same that oft times hath
Charmed magic casements, opening on the foam
of perilous, seas, in faery lands forlorn."

বিচিত্র ভঙ্গিমায় ফুটকিদের (ওয়ার্বলার) উর্ধ্ব নীল আকাশে বিচরণ ও সঙ্গীত সুধাবর্ষণ ভাবুক কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ-এর মনে এক কল্পনাময় আবেগের সৃষ্টি করেছে—

"To the last point of vision, and beyond,
Mount, daring warbler !—that love—prompted strain
—Twixt thee and thine a never- failing bond,
Thrills not the less the bosom of the plain :
yet might'st thou seem, proud privilege ! to sing
All independent of the leafy spring."

সন্তান পালনে ব্যস্ত সদ্য উড়ন্ত পাহাড়ী ঘুঘুর যে অনাবিল বর্ণনা কবি ভার্জিল-এর রচনায় পাওয়া যায় তা আবৃত্তি করার সময় ঐ পাখির ডানা সঞ্চালনের শব্দ বার বার যেন আমাদের কানে ভেসে আসে—

"Qualis spelunca subito commota columba,
cui domus, et dulces latebroso in pumice nidi,
Fertur in arva volans, plausumque exterrita pennis
Dat tecto ingentem—mox aere lapsa quieto,
Radit iter liquidum, celeris neque commovet alas."

"As when a dove her rocky hold forsakes
Rous'd, in a fright her sounding wings she shakes ;

The cavern rings with clattering ; out she flies,
And leaves her callow care, and cleaves the skies ;
At first she flutters ; but at length she springs
To smoother flight, and shoots upon her wings."

এদিকে ভারতবর্ষে পরবর্তী যুগে মহাকবি কালিদাস থেকে আরম্ভ করে বর্তমান কাল পর্যন্ত পাখি সাহিত্যের সর্বত্র বিচরণ করছে। কবি কালিদাস তার রচনার বহুস্থানে বিভিন্ন পাখির আচার-আচরণ, কণ্ঠস্বর অতি নিপুণভাবে বর্ণনা করেছেন। ময়ূর-ময়ূরীর আনন্দনৃত্য ও প্রেমালিঙ্গন তাঁর ঋতু-সংহার কাব্যে অতিসুন্দর ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে—

"সদা মনজ্ঞং স্বনদুৎসবোৎসুকং বিকীর্ণবিস্তীর্ণ কলাপশোভিতম।
মসম্ভ্রমালিঙ্গনচুম্বনাকুলং প্রবৃত্তনৃত্যং কুলমদ্য বর্হিনাম।"

আবার গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড তাপে ময়ূর-ময়ূরীর শরীর ও মন এত ক্লান্ত যে তারা সাপকে কাছে পেয়েও হত্যা করছে না—

"হুতাগ্নিকল্পৈঃ সবিতুগর্ভস্তিভিঃ কলাপিনঃ ক্লান্তশরীরচেতসঃ/ ন ভগিনং
ঘ্নন্তি সমীপবর্ত্তিনং কলাপচক্রেষু নিবেশিতাননম।"

প্রিয়বিয়োগে কাতর চক্রবাক পাখির (ব্রাহ্মনি ডাক) বেদনাময় অভিব্যক্তি ও অতি সুন্দর ভাবে কবি কালিদাসের কাব্যে পাওয়া যায়—

"আয়াতি যাতি পুনরেব জলং প্রয়াতি, পদ্মাঙ্কুরাণি বিচিনোতি ধুনোতি পক্ষৌ।
উন্নত্তবদ্ ভ্রমতি কুজিত মন্দমন্দং, কান্তাবিয়োগবিধুরো নিশি চক্রবাকঃ।"

সুকুমার রায় তার অনেক রচনায় বিভিন্ন পাখির, খাদ্য সংগ্রহ প্রণালী, নীড় তৈরির কারিগরি ও অন্যান্য আচরণ অত্যন্ত নিপুণ ভাবে বর্ণনা করেছেন। যেমন—

"জলের নীচে একটা মাছ বারবার উঠছে আর নামছে, চিল কেবল তাই দেখছে—মাথার উপর যে ঈগলরাজ টহল ফিরছেন সেদিকে তার খেয়ালই নাই। একবার মাছটা যেই ভেসে উঠেছে আর অমনি ছোঁ করে মেছো চিল জলের উপর পড়েছে। তারপর মাছ শুদ্ধ টেনে তুলতে কতক্ষণ লাগে। কিন্তু চিলের মাছ খাওয়া হলো না কেন না ভূতের হাসির মত বিকট চিৎকার করে কি একটা প্রকাণ্ড ছায়া তার ঘাড়ের উপর ঝড়ের মত তেড়ে নামলো। সে আর কিছুই নয়, সিন্ধু ঈগল ; ঐ মাছের উপর তার নিতান্তই লোভ পড়েছে।"

এ ছাড়া বাবুই, টুনটুনি, কুঞ্জপাখি ও ঈগল পাখির নীড় তৈরির বর্ণনা তার "পাখির বাসা" নামে রচনায় পাওয়া যায়। আফ্রিকার ফ্লেমিঙ্গো ও ইস্ট ইণ্ডিয়া দ্বীপপুঞ্জের তালচোঁচ পাখি যারা মুখের লালা দিয়ে নীড় তৈরি করে তার কথাও সুকুমার রায়ের রচনায় বাদ পড়ে নি।

তাঁর 'সঙ্গীহারা' কবিতায় কয়েকটি পাখির রূপ বর্ণনা অত্যন্ত প্রাণবন্ত হয়েছে—

"সবাই নাচে ফূর্তি করে সবাই গাহে গান
একলা বসে হাঁড়িচাচার মুখটি কেন ম্লান ?
দেখচ নাকি আমার সাথে সবাই করে আড়ি—
তাইতো আমার মেজাজ খ্যাপা মুখটি এমন হাঁড়ি।"
"মিষ্টি স্বরে দোয়েল পাখি জুড়িয়ে দিল প্রাণ
তার কাছে কৈ বসলে নাতো শুনলে না তার গান !
দোয়েল পাখির ঘ্যান্‌ঘ্যানানি আর কি লাগে ভালো ?
যেমন রূপে তেমন গুণে তেমনি আবার কালো।
রূপ যদি চাও যাও না কেন মাছরাঙ্গার কাছে,
অমন খাসা রঙয়ের বাহার আর কি কারো আছে !
মাছরাঙা ! তারও কি আর পাখির মধ্যে ধরি
রকম সকম সঙের মত দেমাক দেখে মরি।"

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সম্ভারে পাখির বৈচিত্র্যময় জীবনের কথা নানাভাবে পাওয়া যায়। গ্রীষ্মকালে, প্রচণ্ড দাবানলে বিভিন্ন পাখি তৃষ্ণার্ত ও রৌদ্রতপ্ত—তার সাবলীল বর্ণনা 'মধ্যাহ্ন' কবিতায় পাওয়া যায়—

"বেলা দ্বিপ্রহর।
ক্ষুদ্র শীর্ণ নদীখানি শৈবালে জর্জর
স্থির স্রোতহীন। অর্ধমগ্ন তরী 'পরে
মাছরাঙা বসি, তীরে দুটি গোরু চরে
শস্যহীনমাঠে।"

"শূন্যঘাট-তলে
রৌদ্রতপ্ত দাঁড়কাক স্নান করে জলে
পাখা ঝট্‌পটি। শ্যামশষ্পততটে তীরে
খঞ্জন দুলায়ে পুচ্ছ নৃত্য করি ফিরে।"

"রাজহাঁস
অদূরে গ্রামের ঘাটে তুলি কলভাষ
শুভ্র পক্ষ ধৌত করে সিক্ত চঞ্চুপুটে"
"কভু শান্ত হাম্বাস্বর,
কভু শালিকের ডাক, কখনো মর্মর
জীর্ণ অশ্বথের, কভু দূর শূন্য 'পরে
চিলের সুতীব্র ধ্বনি, কভু বায়ুভরে
আর্ত শব্দ বাঁধা তরণীর—মধ্যাহ্নের
অবক্ত করুণ একতান, অরণ্যের
স্নিগ্ধচ্ছায়া, গ্রামের সুষুপ্ত শান্তিরাশি
মাঝখানে বসে আছি আমি পরবাসী।"

কার্তিকের এক নির্মল অপরাহ্নে কবি ঝিলাম নদীতে বজরার ছাদে বসেছিলেন। সন্ধ্যেবেলায় তাঁর মাথার উপর দিয়ে এক ঝাঁক বুনো হাঁস পুঞ্জীভূত আনন্দে শব্দের ঝড় বইয়ে দিয়ে নিস্তব্ধ অন্ধকারের বুক চিরে শূন্য আকাশকে আন্দোলিত করে দূর হতে দূরান্তে উধাও হয়ে গেল। এই বিবাগী পাখির ডানার শব্দে কবির মনে যে ভাবের উদয় হয় তারই ঐশ্বর্যময় বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে বলাকা কবিতায়ঃ

"হে হংসবলাকা,
ঝঙ্কামদরসে-মত্ত তোমাদের পাখা
রাশি রাশি আনন্দের অট্টহাসে
বিস্ময়ের জাগরণ তরঙ্গিয়া চলিল আকাশে।

ওই পক্ষধ্বনি,
শব্দময় অপ্সররমণী,
গেল চলি স্তব্ধতার তপভঙ্গ করি।
উঠিল শিহরি
গিরিশ্রেণী তিমিরমগন,
শিহরিল দেওদার-বন॥"

"হে হংসবলাকা,
আজ রাত্রে মোর কাছে খুলে দিলে স্তব্ধতার ঢাকা।

শুনিতেছি আমি এই নিঃশব্দের তলে
শূন্য জলে স্থলে
অমনি পাখার শব্দ উদ্দাম চঞ্চল।"

অন্য এক স্থানে কবি বর্ষার আরম্ভে নিজের হৃদয়কে ময়ূর ভেবে উপস্থিত করে বাহ্য প্রকৃতিকে ও অন্তঃপ্রকৃতিকে মিলিয়ে দিয়েছেন—

"হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে, ময়ূরের মত নাচে রে, হৃদয়
নাচে রে।
শত বরণের ভাব-উচ্ছ্বাস
কলাপের মত করিছে বিকাশ,
আকুল পরাণ আকাশে চাহিয়া উল্লাসে কারে যাচে রে।
হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে, ময়ূরের মত নাচে রে।"

ছন্দ-সরস্বতীর বরপুত্র কবি সত্যেন্দ্রনাথ বাংলাদেশের অনন্য বৈশিষ্ট্য ও মাধুর্য বর্ণনাকালে পাখি নিয়ে যে কয়েকটি পংক্তি রচনা করেন তা শিক্ষিত অথবা নিরক্ষর সব বাঙালির কণ্ঠে আজও বারবার ধ্বনিত হয়—

কোথায় ডাকে দোয়েল শ্যামা—
ফিঙে গাছে গাছে নাচে?
কোথায় জলে মরাল চলে—
মরালী তার পাছে পাছে?
বাবুই কোথা বাসা বোনে—
চাতক বারি যাচে রে?
সে আমাদের বাংলা দেশ,
আমাদেরি বাংলা রে!"

বিভূতিভূষণ ছিলেন প্রকৃতির উপাসক। প্রকৃতির অজস্র সৌন্দর্য ও নানা বিষয়, ফুল, ফল, পশু-পাখি অপার কৌতূহল নিয়ে তিনি দেখেছিলেন। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে তার অসংখ্য রচনার প্রায় সর্বত্রই নানাবিধ পাখির বহু ব্যঞ্জনাময় বর্ণনার সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন, "এখানে একখানা শিলাখণ্ডের উপর কতদিন গিয়া একা বসিয়া থাকিতাম। কখনও বনের মধ্যে দুপুর বেলা আপন মনে বেড়াইতাম। কত বড় বড় গাছের ছায়ায় বসিয়া পাখির কূজন শুনিতাম। মাঝে মাঝে গাছপালা, বন্যলতার ফুল সংগ্রহ করিতাম। এখানে যত রকমের পাখির ডাক শোনা যায়, আমাদের মহালে অত পাখি নাই। নানা রকমের

বন্য ফল খাইতে পায় বলিয়া এবং সম্ভবত উচ্চ বনস্পতির শিরে বাসা বাঁধিবার সুযোগ ঘটে বলিয়া সরস্বতী কুণ্ডীর তীরের বনে পাখির সংখ্যা অত্যন্ত বেশী।

এই কয়েকটি ছত্রের মধ্য দিয়েই বিভূতিভূষণের পর্যবেক্ষণ শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। পাখির উপযুক্ত স্থানে নীড় তৈরি করা সম্পর্কে তিনি যে কতটা ওয়াকিবহাল ছিলেন তা বুঝা যায়।

'সরস্বতী কুন্তীর' পাখিদের অপূর্ব বর্ণনা প্রসঙ্গে বিভূতিভূষণের ভাষায় লেখা অনির্বচনীয় বর্ণনার কিছু অংশ 'আরণ্যক' উপন্যাস থেকে তুলে দিচ্ছি।

"পূর্বেই বলিয়াছি সরস্বতী কুন্তীর বন পাখির আড্ডা। এত পাখি আছে এখানকার বনে! কত ধরনের, কত রং-বেরঙের পাখি—শ্যামা, শালিক, বনটিয়া, ফ্রেজান্ট–ক্রো, চড়াই, ছাতারে, ঘুঘু, হরিয়াল। উঁচু গাছের মাথায় বাজবৌরী চিল, কুল্লো–সরস্বতীর নীলজলে বক, সিল্লী, রাজহাঁস, মাণিক পাখি, কাঁক প্রভৃতি জলচর পাখি,—পাখির কাকলীতে মুখর হইয়া উঠিয়াছে ঝোপের উপরটা, কি বিরক্তই না করে, তাদের উল্লাস ভরা অবাক কূজনে কানপাতা দায়। অনেক সময়ে মানুষকে গ্রাহ্যই করে না, আমি শুইয়া আছি দেখিতেছে, আমার চারিপাশে হাত দেড়–দুই দূরে তারা ঝুলন্ত ডালপালায় বসিয়া কিচ্ কিচ্ করিতেছে—আমার প্রতি ভ্রূক্ষেপ নাই।"

"পাখিদের এই অসংকোচ সঞ্চারণ আমার বড় ভাল লাগিত। উঠিয়া বসিয়া দেখিয়াছি তাহারা ভয় পায় না, একটু হয়তো উড়িয়া গেল, কিন্তু একেবারে দেশছাড়া হইয়া পালায় না। খানিক পরে নাচিতে নাচিতে, বকিতে বকিতে আবার অত্যন্ত কাছে আসিয়া পড়ে।"

বিভূতিভূষণের জীবনের শেষ দিকে লেখা কুশলপাহাড়ী গল্পে ময়ূর ও লাল চঞ্চু ধনেশ পাখির কিছু সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায়ঃ

"সুন্দর গড় অরণ্য—প্রকৃতির লীলা নিকেতন। পথে পথে করম গাছের ফুলের ঝরা পাপড়ি বিছানো। লম্বা-ঠোঁট ধনেশ পাখি ও বনটিয়া ডালে ডালে বেড়াচ্ছে। কচ্চিৎ কোন পর্বত-চূড়ায় প্রভাতের সোনালী রোদ এলানো, কচ্চিৎ কোনো পার্বত্য ঝর্ণার জলের ধারে লোহাজালি ফুল ফুটে পাথর ঢেকে ফেলেছে। পথেরও শেষ নেই, অরণ্যেরও শেষ নেই, মুক্ত শৈলমালাবেষ্টিত ভূমিশ্রীরও শেষ নেই, প্রান্তরেরও শেষ নেই। বনে বনে ময়ূর, বনে বনে কেট্‌রা, ভালুক, লেপার্ড।"

বিভূতিভূষণের অমর সৃষ্টি 'পথের পাঁচালী'তেও বহু পাখির নানা বিচিত্র বর্ণনা পাওয়া যায়।

"এতক্ষণে তাহাদের বনে ঘেরা বাড়ীটার উঠানটাতে ঘন ছায়া পড়িয়া আসিতেছে, কিচ্ কিচ্ করিয়া পাখি ডাকিতেছে, সেই মিষ্ট, নিঃশব্দ শান্ত বৈকাল—সেই হলদে পাখিটা আজও আসিয়া পাঁচিলের উপরের কঞ্চির ডালটাতে সেই রকমই বসে, মায়ের হাতে পোঁতা লেবুচারাতে হয়তো এতদিন লেবু ফলিতেছে।

আরো কিছুক্ষণ পরে তাহাদের সেই ভিটায় সন্ধ্যার অন্ধকার হইয়া যাইবে, কিন্তু সে সন্ধ্যায় সেখানে কেহ সাঁজ জ্বালিবে না, প্রদীপ দেখাইবে না, রূপকথা বলিবে না। জনহীন ভিটার উঠান-ভরা কাল মেঘের জঙ্গলে ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকিবে, গভীর রাতে পিছনের ঘন বনে জগ ডুমুর গাছে লক্ষ্মী পেঁচার রব শোনা যাইবে। কেহ কোনদিন সেদিক মাড়াইবে না, গভীর জঙ্গলে চাপা-পড়া মায়ের সে লেবু গাছটার সন্ধান কেহ কোনদিন জানিবে না, ওড়-কলমী ফুল ফুটিয়া আপনা-আপনি ঝরিয়া পড়িবে, কুল, নোনা, মিথ্যাই পাকিবে, হলদে ডানা তেড়ো পাখিটা কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফিরিবে। বনের ধারে সে অপূর্ব মায়াময় বৈকালগুলি মিছামিছিই নামিবে চিরদিন।"

৩। বিভিন্ন শিল্প কলায় পাখি

(ক) ভাস্কর্য

পুরতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বের নথিপত্রে দেখা যায় যে প্রাকপ্রস্তর যুগের মানুষও পাখির বর্ণময় রূপ ও শারীরিক গঠন বৈচিত্র্যে আকৃষ্ট হয়ে নানাভাবে তাকে রূপদানের জন্য চেষ্টা করেছে। ইংলাণ্ডের IPSWICH নামক স্থানে প্রাক-প্রস্তর যুগের (প্লাইওসিন) তৈরি পাথরের কিছু বস্তু পাওয়া গেছে। তার মধ্যে একটি ঈগলের চঞ্চুর আকার সুস্পষ্টভাবে রূপায়িত হয়েছে। এই বস্তুটিকে Rostro-carinates নামে অভিহিত করা হয়।

কয়েক বছর আগে রাজস্থানের গঙ্গানগর ও তার কাছাকাছি স্থানে হরপ্পা সভ্যতার বহু আগের কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে। সংগৃহীত মৃত শিল্পের বহু নিদর্শনে অত্যন্ত বাস্তবতার সঙ্গে হাঁসের জীবন-চিত্র খোদাই করা অবস্থায় পাওয়া গেছে। হরপ্পা ও মহেঞ্জদড়োর সীল-মোহরে ঈগল, ঘুঘু ও মুরগীর ছবি প্রায়ই ব্যবহার করা হয়েছে। মহেঞ্জদড়োতে পাওয়া বিভিন্ন খেলনা, মাটির

তৈরি নানারকম জিনিসপত্র ও চিত্রে ঘুঘু, মুরগী, হাঁস, ময়ূর প্রভৃতি পাখির নানা ব্যঞ্জনময় রূপ খোদাই করা অবস্থায় পাওয়া গেছে। এই রকম এক খোদাই করা কাজে দেখা যায় যে একটি ময়ূর চঞ্চু দিয়ে গাছের ডাল ধরে আছে আর অন্য বহু পাখি নানা ভঙ্গিমায় ঐ ময়ূরটিকে ঘিরে ধরেছে। এছাড়া ঐ স্থানে মানুষের ব্যবহৃত বহুবর্ণ খচিত কাচ দিয়ে মোড়া মাটির পাত্রে ঘুঘু, টিয়া, ময়ূর প্রভৃতি পাখি খোদাই করা অবস্থায় পাওয়া গেছে।

জ্ঞানের আরাধ্য দেবী সরস্বতীর বাহন রূপে হাঁস অনেকদিন থেকেই চিহ্নিত হয়ে আসছে। এগারো শতকে ঐ রূপ সর্বপ্রথম ভাস্কর্যে রূপায়িত হয়। পরবর্তীকালে হাঁসসমেত দেবী সরস্বতীর মূর্তি অসংখ্য ভাস্কর্যে ও মৃতশিল্পে রূপায়িত হয়েছে।

পৌরাণিক গরুড় পাখি স্বর্গ থেকে অমৃত এনেছিল—তাই বোধ হয় বেঙ্গল কেমিক্যালের প্রবেশ দ্বারে দুই স্তম্ভের উপর দুটি গরুড় মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। কলকাতায় কবি নরেনদেবের বাড়ির সামনে স্তম্ভের উপর পূর্বদিকে মুখ করে সূর্য বন্দনায় রত শ্বেত গরুড় পাখির মূর্তি এক অনন্য শিল্প কর্মের উদাহরণ।

দ্বিতীয় শতকে কাবুলের কোনো এক শিল্পীর হাতির দাঁতে খোদাই করা ৪" দীর্ঘ হংসকন্যা আজও বিস্ময় জাগায়। ভারতের বিভিন্ন মন্দির গাত্রে পাখির যে রূপময় ব্যঞ্জনা পরিস্ফুট হয়েছে তা দেখে যে কোনো মানুষ অন্তত কিছুক্ষণের জন্য কল্পলোকে বিরাজ করতে বাধ্য হবে।

(ঘ) চারু কলা

ভারতীয় ভাস্কর্যের মতো চারুকলাতেও পাখি এক অনন্য বিষয়বস্তু হিসাবে স্থান পেয়েছে। এর মধ্যে গরুড়, ময়ূর, কাক, ঘুঘু প্রভৃতি পাখি পৌরাণিক কাহিনীর মুখ্য বিষয় রূপে অঙ্কিত হয়েছে। অন্যদিকে ভাস্কর্যের মতো অঙ্কন শিল্পেও পাখিকে রূপায়িত করা হয়েছে সমগ্র শিল্পসৃষ্টির অঙ্গীভূত বস্তু হিসাবে যা ঐ চিত্র বা ভাস্কর্যকে সুন্দরতর করে তোলে। এ ছাড়াও যুগযুগ ধরে বহু শিল্পী বিভিন্ন পাখির রূপমাধুর্যে ও বর্ণচ্ছটায় এবং তাদের কীর্তি-কলাপে মুগ্ধ হয়ে তুলির আঁচড়ে সেই মুগ্ধতাকে ধরে রাখতে সচেষ্ট হয়েছে।

হিন্দু শাস্ত্রে বিদ্যার আরাধ্যদেবী সরস্বতীর বাহন রূপে শ্বেত হংস স্থান পেয়েছে। এবং বাণীবন্দনার সময় ঐ হাঁস ও পূজো পেয়ে থাকে। দেবী

সরস্বতীকে শ্বেত ভূষণে রূপায়িত করা হয়েছে—যা সুন্দর, শান্ত ও পবিত্রতার প্রতীক। লক্ষণীয় যে দেবীর বাহন রূপে আবার শ্বেত মরালই স্থান পেয়েছে। জীব জগৎ সম্বন্ধে তখনকার মানুষের যে সুস্পষ্ট ধারণা ছিল এ তারই প্রমাণ। বীনাপাণি এই রূপে ভাস্কর্যে, মৃৎশিল্পে ও চিত্রশিল্পে অক্ষয় হয়ে রয়েছে। তিব্বত ও মঙ্গোলিয়ার জ্ঞান ও মুক্তিদায়িনী দেবী ইয়াঙ-চেন-মা-এর পূজো করা হয়। এখানেও দেবীর বাহন রূপে হাঁস স্থান পেয়েছে। এই দেবীর চিত্র রেশম বা সুতির কাপড়ের উপর অথবা প্রাচীর চিত্রে পাওয়া যায়।



চিত্র নং ৫—ইয়াঙ-চেন-মা

সদা চঞ্চলা ধনদাত্রী লক্ষ্মী দেবীর বাহন হয়ে নিশাচর পেঁচা স্থান পেয়েছে। লক্ষ্মী পূজো রাতে করাই নিয়ম। এখানেও একটা জিনিস লক্ষণীয় যে দেবীর বাহন রূপে একটি বিশেষ নিশাচর পাখি স্থান পেয়েছে। দেবী সৌভাগ্যের প্রতীক এবং কাজেই শস্য ধ্বংসকারী ইঁদুর, কাঠবেড়ালি প্রভৃতি প্রাণীর শত্রু পেঁচাকে দেবীর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। বেদে পেঁচাকে লক্ষ্মীর বাহন হিসাবে দেখা যায় না। বৈদিক যুগের পরে কোনো এক সময়ে পেঁচা লক্ষ্মীর বাহন রূপে বাংলাদেশে অঙ্কিত হয়।

মেসোপোটিমায় দুর্ভাগ্যের দেবী লিলিথ-এর বাহন হিসাবে পেঁচাকে দেখা যায়।

মোগল যুগ

ভারতবর্ষে মুঘল যুগের সূচনা থেকেই শিল্পীর তুলিতে অন্যান্য প্রাণী সমেত পাখির ছবি একটা বিশেষ স্থান পেতে আরম্ভ করে। পাখির উপর সম্রাট আকবরের বিশেষ অনুরাগ ছিল। ফলে রাজদরবারের চিত্রশিল্পীরা নানা-ব্যঞ্জনময় ভঙ্গিমায় পাখিকে চিত্রে রূপ দিতে আরম্ভ করেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় এই চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি অত্যন্ত উন্নত ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠে। এই সময়ের বিভিন্ন পাখির ছবি দেখলে বেশ বোঝা যায় যে চিত্রশিল্পীরা ছবি আঁকার আগে অনেক দিন ধরে নির্দিষ্ট পাখির আচার-আচরণ, বর্ণ-সম্ভার ইত্যাদি অতি নিখুঁত ভাবে অনুধাবন করে তবেই সেই পাখিকে চিত্রে রূপদান করতেন। এরই ফলে চিত্রিত পাখি মানুষের কাছে জীবন্ত ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। মোঘল যুগের প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী মনসুরের আঁকা ফকন্ পাখির ছবি দেখলেই তা স্পষ্ট বোঝা যায়। সম্রাট জাহাঙ্গীর ফকনের অত্যন্ত ভক্ত ছিলেন। ফকন্ একটি শিকারী, নিষ্ঠুর ও তীব্র গতিশীল পাখি। শিল্পী মনসুরের তুলিতে জীবন্ত ফকনের সমস্ত রূপ ও রং অত্যন্ত বাস্তবতার সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে। ফকনের নিষ্ঠুরতার পরিচয় পাওয়া যায় অঙ্কিত পাখির বৃহৎ গোলাকার চোখ ও ক্রূর দৃষ্টি এবং তীক্ষ্ণ ও বক্র ঠোঁটের মধ্যে। শিল্পী মনসুর পাখিটিকে একটা গোলাপী দাঁড়ের উপর দাঁড় করিয়ে পেছনে সোনালী রংয়ের পর্দার উপর কিছু দূর্বল তৃণরাজি এঁকেছেন। এই পরিবেশে ফকন্‌টিকে দেখামাত্র তার ভীষণতম প্রকৃতি সহজেই ধরা পড়ে।

১৬৩০ সালে শিল্পী লালচাঁদের আঁকা 'জাহাঙ্গীর, একটি পরী ও একটি নীলশীর পাখি' ছবিটিও অসাধারণ উন্নত মানের। শুধুমাত্র পাখিটির সমস্ত শারীরিক বৈশিষ্ট্যই নিপুণভাবে এঁকে শিল্পী শান্ত হন নি। ঘুমন্ত অবস্থায় নীলশীর পাখির সঠিক অবস্থানের রূপ সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে।

রাজস্থান, গুলার ও কংগরা উপত্যকার অঙ্কন চিত্রে পাখি

১৫শ শতাব্দী থেকেই রাজস্থান ও নিকটবর্তী অন্যান্য স্থানের শিল্পীর তুলিতে পাখি নানা ভাবে চিত্রে রূপায়িত হয়েছে। তারই কয়েকটি নিদর্শন দেওয়া হলো।

১। অষ্টাদশ শতাব্দীতে গুলার শিল্পীর আঁকা ময়ূর আরোহী রূপে কার্তিকের ছবিটিতে বর্ণময় ময়ূরের রূপটি সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে।

২। মেওয়ার কেন্দ্রের সুন্দর শৃঙ্গারের অন্তর্গত একটি ছবিতে দেখা যায় যে কবি হংসবাহিনী দেবী সরস্বতীর কাছে অর্ঘ নিবেদন করতে মন্দিরে প্রবেশ করছেন (১৭২৫ খৃষ্টাব্দে)

৩। দক্ষিণ ভারতের কোনো এক শিল্পীর তুলিতে আঁকা রাগ মেঘ মল্লার-এর রূপটি অতি সুন্দর ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এখানে দেখা যাচ্ছে যে কৃষ্ণসখা ফুল হাতে ময়ূরের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। ময়ূরের সহজতর ভঙ্গিমাটি লক্ষণীয়। (১৭৮০)

৪। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বুন্দেলখণ্ডের কোনো এক শিল্পীর আঁকা রাগ মধুমালতির রূপবিন্যাসে বিভিন্ন ময়ূরের আচরণও নিখুঁত ভাবে দেখানো হয়েছে।

বিংশ শতাব্দীর দোর্দণ্ড প্রতাপশালী শিল্পী পাবলো পিকাসো দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর দক্ষিণ ফ্রান্সে বসবাসের জন্য আসেন এবং ঐ সময় থেকেই লিথোগ্রাফির কাজ আরম্ভ করেন। দক্ষিণ ফ্রান্স ও ভূমধ্যসাগরীয় তীরবর্তী দেশগুলোতে নানা ধরনের পেঁচা পাওয়া যায় এবং ঐ সব দেশের বহু প্রাচীন দেব-দেবীর বাহন রূপে পেঁচাকে দেখা যায়। সম্ভবত সেই কারণেই পিকাসো পেঁচার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। এমন কি সারাক্ষণের সঙ্গী হিসাবে সে সময় পেঁচা তার বাড়িতে বিরাজ করতো। কাজেই দক্ষিণ ফ্রান্সে থাকাকালে পেঁচা তাঁর বহুমুখী শিল্পকলায় একমাত্র বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছিল। পিকাসোর আঁকা 'চেয়ারের উপর পেঁচা' তার সৃজনশীল ক্ষমতার এক উজ্জ্বল উদাহরণ।

(গ) বয়ন-শিল্প

ভারতীয় বয়ন শিল্পে অন্যান্য প্রাণীর সঙ্গে পাখির রূপকল্প ব্যবহার সেই প্রাচীন ভাবধারার উত্তরসূরী। অন্যান্যের মতো বয়ন শিল্পীরাও প্রকৃতির নানা বর্ণময় রূপে মুগ্ধ হয়ে তাদের সৃষ্টকর্মে প্রকৃতির নানা বিষয়কে ধরে রাখার জন্য চেষ্টা করেছেন। এছাড়া শিল্পকর্মকে মানুষের কাছে আকর্ষণীয় ও বহুমুখী করার প্রচেষ্টাও তাদের মধ্যে বিদ্যমান।

সিন্ধুসভ্যতার সময় থেকেই ভারতে মানুষের ব্যবহৃত পোষাক-পরিচ্ছদে ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্ত্রশিল্পে পাখির রূপকল্প মূর্ত হয়ে উঠেছে। সিন্ধুসভ্যতার

বয়ন শিল্পীর কাছে অন্যান্য পাখি অপেক্ষা হাঁস শিল্প-সাধনার সবচেয়ে প্রিয় বিষয়বস্তু ছিল। পরবর্তীকালে ভারতের বিভিন্ন স্থানে বস্ত্রশিল্পে হাঁসের রূপকল্প যথেষ্ট সমাদার লাভ করেছে। গুজরাট ও রাজস্থানে তাই হাঁসকে নানাভাবে ব্যক্ত হতে দেখা যায়। হাঁসের চলমান ছবি ভারতে ও ভারতের বাইরে প্রায়ই মানুষের বিভিন্ন পোষাক-পরিচ্ছদে দেখা যায়। অজন্তার এক নং গুহায় অঙ্কিত চিত্রের পরিধেয় বস্ত্রে হাঁসের ছবি প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। সতের ও আঠারো শতকের পশ্চিম-ভারতে ছাপানো পর্দায় রাজহাঁসের বাহুল্য চোখে পড়ে। অন্যান্য প্রাণীর সঙ্গে পুষ্পিত গাছের ডালে দাঁড়ানো রাজহাঁসের রূপকল্প অত্যন্ত মূল্যবান সামগ্রী বলে বিবেচিত হতো। কুমারস্বামীর মতে বস্ত্রে ব্যবহৃত হাঁসের রূপকল্প সর্বপ্রথম গুজরাট অথবা উত্তর ভারতে আরম্ভ হয়।

ময়ূরের রূপকল্প সিন্ধুসভ্যতার সময় থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত বয়ন শিল্পের আর একটি অনন্য উপাদান। বর্তমানে গুজরাট ও রাজস্থানে চিপিকার কাজে ময়ূর বিশেষ প্রিয় পাখি। এছাড়া চিরালা রুমাল ও পাটোলার কাজে ময়ূরের রূপকে নানাভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়। জাফরগঞ্জ, গুজরাট, রাজস্থান এবং করমণ্ডল উপকূলে বয়ন শিল্পে ময়ূরের ব্যাপক ব্যবহার হয়। এখানকার শিল্পীরা ছোট ছোট বিন্দু ও রেখার সাহায্যে ময়ূরের মূর্তিগুলি রূপায়িত করে। মসলিপট্টম ও গোলকুণ্ডায় তৈরি দেওয়াল পর্দায় বিভিন্ন ভঙ্গিমায় অন্যান্য প্রাণীর সঙ্গে ময়ূরের নানা ব্যঞ্জনময় রূপ দেখা যায়। গুজরাট ও রাজস্থানের বুটির কাজে নানাবর্ণখচিত ময়ূর কাপড়ের প্রায় সমস্ত অংশে ছাপানো হয়। এই কাজে ময়ূরের লেজ বেশ লম্বা ও চওড়া করে তাতে ফুল, লতাপাতা বা বিভিন্ন আকারের রেখা টেনে কাপড়ের সৌন্দর্য বাড়ানো হয়। অন্যদিকে পশ্চিম ভারতের বয়নশিল্পে ময়ূরের বিভিন্ন পালকের ব্যবহার বেশী।

ভারতের অনেক জায়গায় ছাপানো কাপড়ে টিয়া পাখির ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। গুজরাটে টিয়াপাখিকে পোপাত ও রাজস্থানে টোনটা বলা হয়। এই দুই স্থানে বুটির কাজে বা চাদর ও শাড়ীর পাড়ে বেশীরভাগ সময়ে নানা ভঙ্গিমায় টিয়াপাখি ছাপানো হয়। এছাড়া এখানে পাটোলা বয়নশিল্পে টিয়াপাখির আচরণ অসাধারণ দক্ষতায় মূর্ত হয়ে থাকে। অন্যদিকে দক্ষিণ-ভারতে ছাপানো কাপড়ে পুষ্পিত গাছের ডালে বসা বা উড়ন্ত টিয়াপাখির রূপকল্প গ্রহণ করা হয়। আবার 'টাই এবং ডাই' প্রক্রিয়ার সাহায্যে টিয়াপাখিকে চুনারিতে ব্যবহার করা হয়। ব্লক প্রিনটেড শাড়ীতে লাল,

কালো, সাদা ও সবুজ রংয়ের টিয়ার আধিক্য দেখা যায়। বিখ্যাত চিরালা রুমালে টিয়ার বিভিন্ন আচরণের রূপকল্প অসাধারণ নিপুণতার সঙ্গে আঁকা হয়। এরমধ্যে গাছের ডাল মুখে উড়ন্ত টিয়ার ব্যবহারই বেশী। আবার শাড়ীর পাড়কে যখন আকর্ষণীয় করার প্রয়োজন হয় তখন বড় আকারের টিয়াপাখি আঁকা হয়।

ভারতের কয়েকস্থানে কাক ও বয়নশিল্পে স্থান পেয়েছে। করমণ্ডল উপকূলে ছাপানো কাপড়ে অন্যান্য পাখির সঙ্গে উড়ন্ত কাকের ব্যবহারই বেশী। দক্ষিণ ভারতের দেওয়াল পর্দায়ও আঠারো শতকের বয়নশিল্পে কাকের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রূপ দেখা যায়।

ভারতে পাশ্চাত্য সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ওদেশের ভাবধারায় মুরগীর রূপকল্প বয়নশিল্পে স্থান পেতে আরম্ভ করে।

করমণ্ডল উপকূলের বয়ন শিল্পীরা ছাপানো কাপড়ে পায়রার ছবিও ব্যবহার করে থাকে। কখন কখন রাজপ্রাসাদের ছাদে বসা পায়রার রূপটি সুন্দরভাবে রূপায়িত হয়। রাজস্থানে মেয়েদের ব্যবহারযোগ্য স্কোল-এ নানারূপে পায়রাকে চিত্রিত করা হয়। ওখানে এর নাম 'কাবু-বেল'। জয়পুরের একটি স্কার্ফে পায়রার যে ব্যঞ্জনময় রূপকল্প ব্যবহার করা হয়েছে তার উল্লেখ করা প্রয়োজন—এই সূতির স্কার্ফটিতে বিভিন্ন ফুল ও পায়রার ছবি সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। স্কার্ফটির দুই প্রান্ত বা প্যালসরে হাল্কা হলুদ পরিবেশে পাতায় ভরা একটি ছোট ডালের উপর বিচিত্র ভঙ্গিমায় বসা ধূসর রংয়ের পায়রার ছবি সমস্ত স্কার্ফটিকে এক অনন্য সম্পদে পরিণত করেছে। এটি বর্তমানে কলকাতার ভারতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে।

কালিদাসের 'রঘুবংশে' দেখা যায় যে তখনকার দিনে বিয়ের সময় নববধূ যে কাপড় পড়তো তার আঁচলের কোণে একটি হংস-মিথুনের ছবি থাকতো—

"আমুক্তভরণঃ স্রগ্বী হংস-চিহ্ন দুকূলবান।
আসীদ্ অতিশয়-প্রেক্ষ্যঃ স রাজ্যশ্রী-বধূ-বর"।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

১। মানুষের খাদ্যরূপে পাখি

ডিম ঃ সুদূর কোন অতীতে বিভিন্ন পাখির ডিম যে মানুষের খাদ্য-তালিকায় স্থান করে নিয়েছিল তার হদিস আজ আর পাওয়া যায় না। জানা গেছে যে কৃষি সমাজব্যবস্থা উদ্ভূত হবার বহু আগে থেকেই মানুষ পাখির ডিমকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করেছিল। তখন যে কোনো সহজলভ্য পাখির ডিমকেই খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করা হতো। কালক্রমে মুরগীর ডিম অন্যান্যকে পেছনে রেখে মানুষের একটা অতি আবশ্যক খাদ্যবস্তু রূপে নিজের স্থান করে নেয়। মুরগীর ডিমই বোধহয় একমাত্র প্রাণীজাত খাদ্য যা পৃথিবীর সব সমাজে প্রচলিত। বর্তমানে মুরগী ছাড়াও আরও অনেক পাখির ডিম মানুষ খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করেছে।

খাদ্যের তিন প্রধান উপাদান Protein, Fat ও Carbohydrate-এর মধ্যে প্রথম দুটি ডিমে যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান। বিভিন্ন ধরনের খনিজ পদার্থ—যথা লৌহ, ক্যালসিয়াম ও ফসফারস এবং প্রায় সবরকম জানা ভিটামিন পাখির ডিম-এর মধ্যে পাওয়া যায়। এছাড়া একটি প্রয়োজনীয় হরমোনের সন্ধান মুরগীর ডিমের মধ্যে পাওয়া গেছে। [পরিশিষ্ট—৯]

ডিমের মধ্যে যে Protien থাকে মানুষ তার শতকরা ৯৮ ভাগ হজম করতে পারে। আর এই Protein অন্যান্য Protein থেকে অনেক বেশী কার্যকরী। এমন কি দুধ ও মাংস থেকেও অনেক উপকারী। ডিমের মধ্যে চর্বির যে অংশ আছে তারও প্রায় শতকরা ৯৬ ভাগ হজম হয়ে যায়। ভিটামিন শরীর রক্ষার জন্য বিশেষ প্রয়োজন। আগেই বলেছি ডিমের মধ্যে প্রায় সবকয়টি গুরুত্বপূর্ণ ভিটামিন আছে। ভিটামিন 'এ' সমস্ত প্রাণীর পক্ষে অতি প্রয়োজন। এর অভাবে নানা রকম রোগের উৎপত্তি হয়। ভিটামিন 'এ'র অভাব ঘটলে মানুষ ধীরে ধীরে রাতকানা হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় অনেকে রুগীকে প্রতিদিন দুটি করে ডিম খাইয়ে সুফল পেয়েছেন। ভিটামিন 'ডি' অন্যান্য খাদ্যে বিশেষ পাওয়া যায় না। কিন্তু মুরগীর ডিমে এই ভিটামিন প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। শিশুদের Ricket সারাবার পক্ষে ভিটামিন 'ডি' তথা মুরগীর ডিম একটা উৎকৃষ্ট হাতিয়ার। দেখা গেছে যে, যদি এই রোগগ্রস্ত শিশুকে প্রতিদিন দুটি করে ডিম খাওয়ানো যায় তবে তিন সপ্তাহের মধ্যে অবস্থার অনেক উন্নতি

হয়। প্রস্থতিদের শরীর রক্ষার জন্যও ভিটামিন 'ডি' বিশেষ প্রয়োজন। এ প্রয়োজন মেটাতে মুরগীর ডিম অদ্বিতীয়। মানুষের স্বাভাবিক প্রজনন ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য ভিটামিন 'ই' আবশ্যক। পাখির ডিম এ কাজেও আমাদের সাহায্য করে। ক্ষতস্থানের রক্ত জমাট করার জন্য Porthrombin-এর বিশেষ দরকার। এই বস্তুটি আবার ভিটামিন 'কে'-এর অভাবে তৈরি হতে পারে না। ডিম-এর মধ্যে এই ভিটামিনটির সন্ধান পাওয়া গেছে বলে অনেক দাবী করেন। এ ছাড়া পাখির ডিমে ভিটামিন 'বি'-ও আছে। এর কাজের ব্যাপকতা সকলেরই প্রায় জানা আছে।

পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, যদি কোন শিশুকে (২—৬ বৎসর) একুশ মাস ধরে প্রতিদিন একটি করে ডিম খাওয়ান যায় তবে সাধারণ ভাবে তার শরীরের এবং বিশেষ ভাবে তার রক্তের লোহিত কণিকার প্রভূত উন্নতি ঘটে। এ ব্যাপারে মাংস ও ছানা অপেক্ষাও ডিম বেশী কার্যকরি। এই কারণে অনেক চিকিৎসক শিশুদের দু-মাস বয়স থেকেই ডিমের কুসুম খাওয়াবার জন্য বলে থাকেন। এমন কি কেউ কেউ জন্মের প্রথম দু-দিনের শিশুকে দুধের বদলে ডিমের কুসুম দেবার পরামর্শ দিয়েছেন। ডিমের মধ্যে যে সব হরমোনের কথা আগে বলা হয়েছে তা বহুমূত্র রুগীর রক্তের চিনির পরিমাণ কমিয়ে দিতে সক্ষম বলে জানা গেছে।

ডিমের এই যে বিভিন্ন উপকারিতা তা বহু অংশে নির্ভর করে আমাদের ডিম খাওয়ার পদ্ধতির উপর। অনেকের ধারণা আছে, যে কাঁচা ডিম সবচেয়ে উপকারী। প্রকৃত পক্ষে কাঁচা ডিম শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর। কেন না খাদ্য হজম করার জন্য পাকস্থলি ও অন্ত্রে যেসব রস নির্গত হয় কাঁচা ডিম খেলে তাদের নির্গমন বিশেষভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়। তাছাড়া কাঁচা ডিম Trypsin ঘটিত পরিপাক ক্রিয়া ব্যাহত করে। অন্যদিকে কাঁচা ডিমের Albumen পাকস্থলিতে এক বিষাক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে থাকে। সর্বোপরি এই Albumen-এর শতকরা মাত্র ৪৫ ভাগ মানুষ হজম করতে পারে। ফলে পরিপাক না হওয়া Albumen পেটে নানা রকম গোলমাল সৃষ্টি করে। ডিম সেদ্ধ করে খেলে এইসব দোষ দূর হয় যদিও ৫-১০ মিনিট সেদ্ধ করলে বা ভাজলে Protein অনেকটা নষ্ট হয়ে যায়।

এত গুণ সম্পন্ন হওয়া সত্বেও মুরগী তথা অন্যান্য পাখির ডিম কিন্তু কলঙ্ক মুক্ত নয়। পাখির ডিমের সাহায্যে আরেকটি আন্ত্রিক রোগের জীবাণু মানুষের

শরীরে প্রবেশ করে মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে থাকে। এ ছাড়া বহু রকমের কৃমি ও ব্যাকটিরিয়া ডিমের খোলার উপর থাকতে পারে। এই সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা পেতে গেলে ডিম সেদ্ধ করে অথবা ভেজে খেতে হবে। ময়লা ডিম না কেনাই শ্রেয় আর ফাটা ডিম তো ঘরেই আনা উচিত নয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে শরীর রক্ষার জন্য পাখির ডিমের মত এমন সর্বগুণ সম্পন্ন খাদ্যবস্তু আর বিশেষ নেই। না, দুধও এর সঙ্গে ঠিক পেরে উঠে না। দেখা গেছে যে, আট আউন্স দুধের কাজ একটা ডিমের দ্বারা সম্পন্ন হয়ে থাকে।

নীড়

মানুষের খাদ্য তালিকায় পাখির ডিম ও মাংস ছাড়াও আরও একটি বস্তু অতি সুস্বাদু খাদ্য হিসেবে বেশ কয়েকটি দেশের মানুষের কাছে সমাদর পেয়ে থাকে। এই খাদ্যবস্তু হচ্ছে গিরিশা [(Collocalio sp), Edible swiftlet] পাখির নীড়। এই পাখি সঙ্ঘবদ্ধভাবে দক্ষিণ বর্মার উপকূলে ও পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের পর্বতময় দ্বীপে প্রজনন ঋতুতে নীড় তৈরি করে। প্রজনন ঋতুতে গিরিশা পাখির মুখের লালাগ্রন্থি অত্যন্ত বড় হয়ে যায়। ঐ গ্রন্থি নিঃসৃত লালা দিয়ে ঐ পাখি পাহাড়ের গায়ে প্রায় বার ইঞ্চি আয়তনের নীড় তৈরি করে। চীন দেশ ও পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীরা ঐ নীড় নানাভাবে রান্না করে পরম তৃপ্তির সঙ্গে আহার করে।

ভারতবর্ষ থেকে বর্মা ভাগ হবার আগে গিরিশা পাখির রক্ষণা-বেক্ষণ ও নীড়ের ব্যবসা বর্মার লোকদের এক অর্থকরী পেশা ছিল। শুধু চীনদেশেই ঐ নীড় রপ্তানি করে বছরে প্রায় ২৫ লক্ষের মতো টাকা সংগৃহীত হতো। উৎকৃষ্ট মানের একসের নীড়ের দাম প্রায় তিরিশ টাকার কমে বিক্রী হতো না।

ভারতবর্ষের কঙ্কন উপকূলেও কয়েকটি ছোট ছোট দ্বীপে ঐ পাখি নীড় তৈরী করে। তবে এ সব নীড়ের গুণগত উৎকৃষ্টতা কম। তাই এর ব্যবসার প্রসার তেমন হয় নি। সঠিকভাবে যদি কঙ্কন উপকূলের তালচোঁচ পাখির রক্ষণা-বেক্ষণ করা যায় তাহলে ঐ পাখির তুচ্ছ লালা ভারতবর্ষকে অনেক বিদেশী মুদ্রা এনে দিতে পারে।

২। অন্যান্য প্রয়োজনে পাখি

(ক) **পালক :** প্রস্তর যুগ থেকেই মানুষ বহুবর্ণ পালকের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাকে মূল্যবান সম্পদ রূপে ব্যবহার করেছে। দক্ষিণ আমেরিকার তৃণ

ভূমিতে রীহি পাখির বহুবর্ণখচিত পালক আজও অনেক মানুষের জীবিকার প্রধান উৎস। প্রতি বছর মে ও জুন মাসে ঐ দেশের পাখি শিকারীর দল রীহির সন্ধানে তাদের বাসস্থান ব্রাজিলের তৃণভূমিতে ছড়িয়ে পড়ে। এদের এক-একটি দলে ছ-জন করে লোক থাকে। ঐ শিকারীর দল রীহি ধরার জন্য নানা রকম জাল তৃণভূমিতে পেতে রাখে। পরে সঙ্ঘবদ্ধ রীহির দলকে তাড়া করে নিয়ে এসে ঐ জালের মধ্যে ঠেলে দেয়। প্রতিদিন এইভাবে এক-একটি শিকারীর দল প্রায় ৬০টি করে রীহি পাখিকে সংগ্রহ করতে পারে। পরে ঐ পাখিগুলির লেজের পালক ছিঁড়ে জমা করা হয়। যন্ত্রণায় কাতর হলেও এই নিরীহ পাখির দল বেঁচে থাকে এবং পরের বছর আবার শিকারীর জালে পড়ে। রীহির জীবন নাট্য এইভাবেই চলতে থাকে। সংগৃহীত পালক দিয়ে শিকারীর দল ডাসষ্টার তৈরি করে ব্রাজিল ও আর্জেনটেনিয়ায় বিক্রি করে। ছ-মাস কাজ করে পাখি শিকারীর দল পালকের ডাসষ্টার বিক্রি করে যে অর্থ উপার্জন করে তা দিয়ে বছরের বাকি দশমাস ওদের অত্যন্ত স্বাচ্ছল্যের মধ্যে কেটে যায়।

পৃথিবীতে এখনও এমন একটি দেশ আছে যেখানে পাখির পালক অর্থ (currency) হিসাবে ব্যবহৃত হয়। দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত ঐ দ্বীপটির নাম সান্তাক্রুজ। যে পাখির পালকের এত কদর তার নাম 'হানি ইটার'। এই পাখির পালক দিয়ে তৈরি বেল্ট অষ্ট্রেলিয়ান ডলারের সঙ্গে হস্তান্তর যোগ্য। তাছাড়া ঐ বেল্টের উপযুক্ত যৌতুক দিয়ে সান্তাক্রুজের পুরুষ স্ত্রী লাভ করে থাকে। তিরিশ ফুট লম্বা দশটি বেল্টের দাম আমাদের হিসাবে প্রায় ৪০০ টাকা।

হানি ইটার ধরার জন্য শিকারীর দল গাছের ডালে এক রকম আঠাল রস লাগিয়ে রাখে। তারপর একটি পুরুষ পাখির পায়ে সুতো বেঁধে পাখিটিকে ছেড়ে দেওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য 'হানিইটার' ওই হতভাগ্য পাখিটিকে আক্রমণ করতে এসে নিজেরাই গাছে লাগানো ঐ আঠাল রসে আটকে যায়। পাখি শিকারীর দল ওদের সংগ্রহ করে লাল পালকগুলি ছিঁড়ে নারকেল খোলার মধ্যে সাজিয়ে রাখে। পরে নারকেল খোলায় সাজানো পালক ওরা অন্য আর এক দল লোকের কাছে বিক্রি করে। এদের কাজ পালকগুলিকে আঠা দিয়ে জোড়া দেওয়া। জোড়া দেওয়ার কাজ শেষ হলে ওগুলি আবার আর একদল লোকের কাছে বিক্রি করে দেয়। এরা জোড়া দেওয়া পালক দিয়ে বেল্ট তৈরি করে বাজারে বিক্রি করে।

অবিভক্ত ভারতের সিন্ধুপ্রদেশে বক পাখির খুব কদর ছিল। ঐ পাখির পালক দিয়ে তৈরি বিলাস দ্রব্য ঐ স্থানে এক বাড়ন্ত কুটীর শিল্পে পরিণত হয়েছিল।

প্রজনন ঋতুতে একরকম বর্ণময় পালক তার দেহে দেখা দেয়। এই বিশেষ ধরণের পালক যাকে বলা হয় 'aigrettes'—এই বিশেষ পালক দিয়ে মেয়েদের টিপেট বা গলার আবরণ ; মাথা বা হাতের ঢাকা ও অন্যান্য পোষাক তৈরি হতো। পালকের ঐ পোষাক সোনার দরে সমস্ত ইউরোপে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হয়েছে।

গ্রীণল্যাণ্ডের অধিবাসী এস্কিমোরা পাখির পালকের পোষাক পরে তীব্র শীত থেকে নিজেদের রক্ষা করে। তাছাড়া নানারকম বিলাসদ্রব্য, sleeping bag, শাল ও অন্যান্য পোষাক-পরিচ্ছদ বিভিন্ন পাখির পালক দিয়ে আজও তৈরি হয়। মুরগির পালক দিয়ে তৈরি ডাসষ্টার এখনও অনেক দেশে ব্যবহার হয়।

(খ) **গোয়ানো**ঃ শস্যক্ষেত্রে সার হিসাবে ব্যবহারের জন্য কয়েক রকম পাখির বিষ্ঠার ব্যবহার অনেকদিন থেকেই প্রচলিত। দক্ষিণ আমেরিকার পেরুর উপকূলের দক্ষিণে অবস্থিত গোয়ানপ দ্বীপে বুবিজ ও গোয়ানো করমোরাণ্ট নামে দুটি প্রজাতির পাখি পাওয়া যায়। এই পাখিদের প্রধান খাদ্য মাছ, বিশেষ করে ওরা anchovis মাছের বিশেষ ভক্ত। প্রায় সাতাশ শতাব্দী ধরে এই পাখিদের বিষ্ঠা গোয়ানপ দ্বীপে স্তরে স্তরে জমা হয়ে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে প্রায় ১৫০ ফুট উঁচু হয়ে উঠেছিল। প্রাচীনকাল থেকেই ইনকা জাতি শস্যক্ষেত্রে পাখির বিষ্ঠা সার হিসাবে ব্যবহার করে এসেছে। কিন্তু নাইট্রোজেন ও ফসফরাসযুক্ত বিষ্ঠা সভ্য জগতের মানুষ সাম্প্রতিককালে সার হিসাবে ব্যবহার করতে শেখে। ফলে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে পেরু প্রায় দু-কোটি টন গোয়ানো বা পাখির বিষ্ঠা দ্বীপ থেকে উত্তোলন করে বিদেশে রপ্তানি করে। এতে পেরুর অর্থ ভাণ্ডারে জমা হয় প্রায় ৭১৫,০০০,০০০ ষ্টারলিং পাউণ্ড। ঐ সময়ের পর থেকে সারা পৃথিবীতে গোয়ানোর চাহিদা অত্যন্ত বেড়ে যায় ফলে সঞ্চিত গোয়ানোর পরিমাণ ধীরে ধীরে কমতে থাকে। তাই কয়েক বছর ধরে বুবিজ ও গোয়ানো করমোরাণ্টদের বিশেষভাবে রক্ষা করা হচ্ছে। ফলে বর্তমানে গোয়ানোর পাহাড় আবার উঁচু হতে আরম্ভ করেছে। এ ছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকার উপকূলবর্তী অঞ্চলে ও ড্যাসেন

দ্বীপে বর্তমানে প্রায় ৫০,০০০ ট্যাকাস পেনগুইন (*Spheniscus demerus*) নামে গোয়ানো উৎপন্নকারী একটি প্রজাতির পাখি বাস করে। ঐ স্থানের জল দূষিত হবার আগে কয়েক লক্ষ পেনগুইন ওখানে বাস করতো। এছাড়া ন্যাট ও পানকৌড়ির বিষ্ঠা থেকেও ভাল সার পাওয়া যায়।

আমাদের দেশের যেসব পাখি সঙ্ঘবদ্ধভাবে নীড় তৈরী করে তাদের 'তরল বিষ্ঠা' সার হিসাবে ব্যবহার করা যায় কিনা তার জন্য ব্যাপক গবেষণা আরম্ভ করা প্রয়োজন।

(গ)

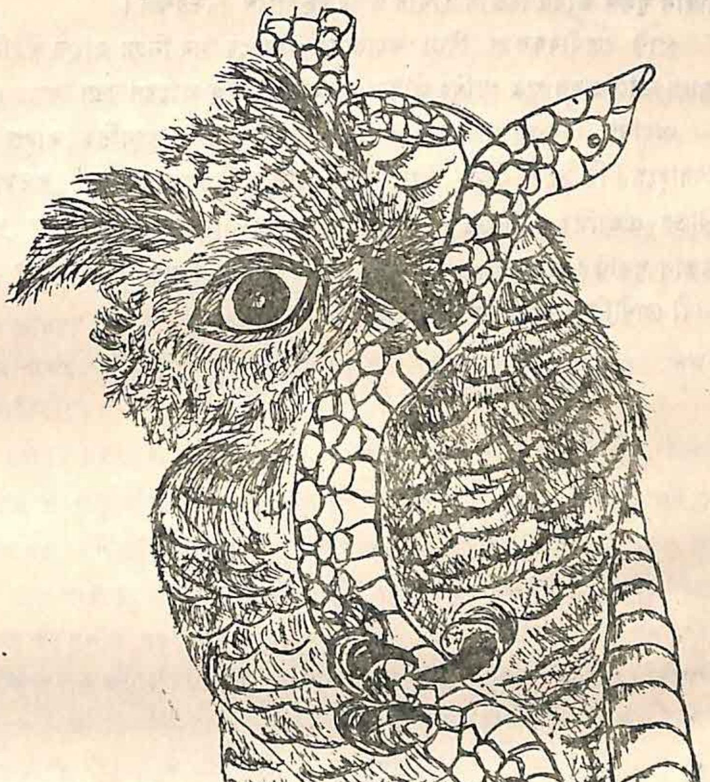
১। প্রতি বছর আমাদের দেশে প্রায় ৪০ হাজার লোক সাপের কামড়ে প্রাণ হারায়। যদিও সঠিক পরিসংখ্যা নেই তবুও বিভিন্ন সমীক্ষা থেকে জানা যায় যে পেঁচা, ঈগল, চিল প্রভৃতি পাখি বহু সাপ ধ্বংস করে। এর মধ্যে ঈগলের প্রধান খাদ্য সাপ। আফ্রিকার কেরাণী পাখির প্রধান খাদ্য বিভিন্ন রকমের সাপ। সাপের সন্ধানে এই পাখি সারাদিনই সভানার জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। দক্ষিণ আমেরিকার Laughing falcon ও ইউরোপের সাপমার চিল এরও প্রধান খাদ্য বিভিন্ন রকমের সাপ।

২। অন্যান্য খাদ্য সমেত রাজহাঁস প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন জলজ উদ্ভিদ খেয়ে জলাশয়গুলিকে পরিষ্কার রাখে। এ ছাড়া কারণ্ডব পাখিও ডুবন্ত জলজ উদ্ভিদ খেয়ে জলাশয়কে পরগাছা মুক্ত করে।

৩। বিশ্বের সব দেশেই পায়রাকে মঙ্গল বা শান্তির দূত মনে করা হয়। তাই আজও কোনো রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক অনুষ্ঠানের পূর্বে ঐ অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করে শত শত পায়রা নীলাকাশে মুক্ত করে দেওয়ার রীতি প্রায় সব দেশেই প্রচলিত।

৪। ওড়িশার রাষ্ট্রীয় পুলিশ শিখন কেন্দ্রে পায়রা রক্ষণা-বেক্ষণ ও বিভিন্ন কাজে তাদের ব্যবহার করার জন্য নানা রকম শিক্ষা দেওয়া হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কোরিয়ার পায়রার সংস্থা গঠন করা হয়। হাজার খানেক পায়রাকে বিপদসঙ্কুল, দূরতিগম্য পাহাড়-পর্বতে ও বন-জঙ্গলের পুলিশ চৌকিতে নানা কাজের জন্য রাখা হয়। তাছাড়া ওড়িশার গীর্জার চূড়ায়, কারখানার চিমনি ও সৌধ মিনারের উপর পায়রার জন্য ঘর করে রাখা হয় যাতে তারা ঐ সব স্থান থেকে দূরবর্তী স্থানের প্রতি নজর রাখতে পারে।

৫। জীবন বিজ্ঞানের অনেক তত্ত্ব ও মতবাদ প্রতিষ্ঠায় পাখির দান অপরিসীম। তারই একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ প্রাণী সংস্থান মূলক জীবন বিজ্ঞান



চিত্র নং ৬—সর্পভূক পেঁচা

শাখার (Zoogeography) উৎপত্তি। পৃথিবীতে যত প্রাণী আছে তাদের সকলকে সমসত্ত্বভাবে ছয়টি মহাদেশে পাওয়া যায় না। প্রত্যেক মহাদেশেরই নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রাণী আছে। ১৮৫৮ সালে পক্ষিতত্ত্ববিদ Philip Sclater পাখি সংস্থানের উপর নির্ভর করে ভূপৃষ্ঠকে ছয়টি প্রাকৃতিক অঞ্চলে

ভাগ করেন। শতাব্দীকালের মধ্যে তার এই প্রাকৃতিক অঞ্চলের মতবাদের কোনো পরিবর্তন হয় নি। বস্তুত বিবর্তনবাদ ও আর কয়েকটি শাখা প্রাণী-সংস্থান মূলক জীবন বিজ্ঞান শাখার উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল।

প্রাণী শ্রেণীবদ্ধকরণ বিদ্যা অধ্যয়নের জন্য ,যে সব নিয়ম কানুন প্রচলিত আছে তাদের মূল সূত্র পাখির জীবন ইতিহাস থেকেই আহরণ করা হয়েছে।

প্রধানত এককরূপে প্রতিটি প্রাণী প্রজাতিকে পারস্পরিক সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের ভিত্তিতে বর্ণনা করে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা হয়। বর্তমানে বিভিন্ন প্রজাতির আচরণগত মিল ও অমিলের উপর নির্ভর করে প্রাণী শ্রেণী বিন্যাস পদ্ধতির সূচনা হয়েছে। আর পাখির আচরণ অধ্যয়নের সাহায্যেই এই প্রাণী শ্রেণীবিন্যাসের সূত্রপাত।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

১। পাখি কেন গান গায়

পাখির গান শুনে আমরা যতই মুগ্ধ হই না কেন, তারা কিন্তু আমাদের তুষ্টির জন্য গান গায় না। গান করা গায়ক পাখির জীবনের এক বিশেষ ও প্রয়োজনীয় অধ্যায়।

কার্যত পাখির গান ও ডাকের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। পাখির ডাক যখন একটি ছন্দে উচ্চারিত হয়ে আমাদের কাছে শ্রুতিমধুর মনে হয় তখনই সেই ডাককে আমরা গান বলে থাকি। আসলে পাখির গান কতকগুলি এক রকম শব্দের সমষ্টি যা ঐ রকম আর এক শব্দ সমষ্টির থেকে কিছু সময় অন্তর উচ্চারিত হয়।

যৌন-হরমোনের কার্যকারিতায় পাখির গান পরিপূর্ণতা লাভ করে। সাধারণত টেরিটোরিয়াল পুরুষ পাখিই গান গাইতে পারে। দেখা গেছে যে পাখি যত বেশি টেরিটোরিয়াল সে পাখি তত উচ্চাঙ্গের গান গায়।

গান গাইতে পারে এমন কয়েকটি প্রজাতির পাখি যারা কয়েক বছর একই স্ত্রী-পুরুষে ঘর করে তারা এক ধরনের দ্বৈত সঙ্গীতে বিশেষ পারদর্শী। এ ক্ষেত্রে এক জনের গান বন্ধ হয়ে যাবার পর আর একজন গান ধরে ; (Antiphonal duet) এবং এভাবে বেশ কিছুক্ষণ গান গাওয়া চলতে থাকে। কিন্তু স্ত্রী পুরুষের গানের শব্দ সমষ্টি আলাদা হয়ে থাকে।

যেসব পাখি গ্রীষ্মমণ্ডলের গভীর জঙ্গলে বিশেষত দৃষ্টিগোচরতাহীন স্থানে বসবাস করে তাদের মধ্যেই সাধারণত অ্যানটিফোনাল দ্বৈত সঙ্গীত শোনা যায়। এরা সাধারণত সারা বছরই গান গায় যদিও প্রজনন ঋতুতে এর তীব্রতা ও স্থায়িত্ব অনেক বেড়ে যায়।

গভীর জঙ্গলে বসবাসকারি পাখি একজনের গানের নির্দিষ্ট ধ্বনি ও অধিক সময়ের ব্যবধানে উচ্চারিত ধ্বনি থেকে নিজের সঙ্গীকে সনাক্ত করে থাকে। কেননা বিভিন্ন যুগলের গানের মধ্যে প্রচুর তফাত থাকে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যদি কোনো একটি পাখি বেশ কিছুক্ষণ টেরিটোরির বাইরে থাকে তবে অন্য জন অধীর হয়ে সঙ্গীকে ফিরে আসার জন্য 'উভয়ের উচ্চারিত স্বরে (whole duet) গান গাইতে থাকবে। আমরা যেমন কাউকে নাম ধরে ডাকি এও

ঠিক তাই। সঙ্গীটি ফিরে এলে মিলিত হওয়ার আনন্দে পাখি দুটি ৩/৪ সেকেণ্ডের জন্য একই সঙ্গে গান গায়।

আগেই বলেছি যে পুরুষ পাখি প্রজনন ঋতুতে গান গায়। একই প্রজাতির বিভিন্ন পাখির গানে প্রচুর অমিল থাকে। কিন্তু কোনো একটি পাখির গান সবসময়ে একই রকম হয়। যদিও বিভিন্ন সময়ে স্বরের তীব্রতা ও সময়ের ব্যবধানের পার্থক্য থাকে। পাখির গানের উচ্চারিত ধ্বনি সমষ্টি সাধারণত ৩-৪ সেকেণ্ড পর্যন্ত ব্যাপ্ত থাকে। একটি পুরুষ পাখি তার প্রজাতির অন্য আর একটি পাখিকে তার গান শুনে সনাক্ত করতে পারে। সমীক্ষায় দেখা গেছে যে একই প্রজাতির পাখির গান বিভিন্ন ভৌগোলিক স্থানে বিভিন্ন রকমের হয়।

পুরুষ পাখির গানের প্রধান উদ্দেশ্য দুটি। এক, প্রজননের জন্য মেয়ে পাখিকে আকর্ষণ করা ; দুই, প্রজনন স্থান (breeding territory) রক্ষা করা ও অন্য পুরুষকে সতর্ক করা। প্রজনন ঋতু আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে পুরুষ পাখিরা বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে একটা সুবিধা মতো স্থান অধিকার করার জন্য চেষ্টা করে। স্থানটি তার পছন্দ হলে উচ্চস্বরে গান করে তা জানিয়ে দেয়—অধিকৃত স্থানটি (territory) তার জন্য সংরক্ষিত, এখানে সে নীড় তৈরি করে সংসার করবে—অন্য কোনো পুরুষ পাখির এ স্থানের উপর নজর দেওয়া চলবে না। তবুও ঐ প্রজাতির অন্য কোনো পুরুষ ভুলে অথবা ইচ্ছে করে অন্য পাখির সংরক্ষিত স্থানে উপস্থিত হয় তবে মালিক কালবিলম্ব না করে উচ্চস্বরে গান আরম্ভ করবে—অর্থাৎ জানিয়ে দিচ্ছে, অনুপ্রবেশকারী তুমি পালাও। অনুপ্রবেশকারী পাখি সাধারণত সহজেই স্থান পরিত্যাগ করে চলে যায়।

স্থান সংরক্ষণের পরে পুরুষ পাখিটি ঐ জায়গা থেকে প্রায় সারাদিন গান গেয়ে থাকে। ঐ যে কোকিল বসন্তের মন্ত্র গুঞ্জরণ আরম্ভ হলে উঁচু গাছের ডালে বসে সারাদিন কুহু কুহু কুহু করে গান করে চলে তা আমাদের মনকে চঞ্চল করলেও ও গান কোকিল আমাদের জন্য করে না। সে গাইছে মেয়ে কোকিলদের আকর্ষণ করার জন্য।

গানের সাহায্যে পুরুষ পাখি মেয়ে পাখিদের জানায় যে—আমি নীড় তৈরির জন্য একটা মনোরম স্থান অধিকার করেছি, আমি তোমার উপযুক্ত জীবনসঙ্গী হয়ে তোমাকে সুখী করতে পারবো। ঐ স্থানের কাছাকাছি যেসব মেয়ে পাখি থাকে তারা প্রজনন ঋতুর প্রথম দিকে পুরুষের ঐ গানে কোনো

আকর্ষণ দেখায় না যদিও অত্যন্ত সতর্ক থাকে। ফলে পুরুষ পাখির গানের তীব্রতা ও ব্যাপ্তি ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। অবশেষে ঐ গানের কাছে মেয়ে পাখি হার মানে এবং নিস্পৃহতা কাটিয়ে ধীরে ধীরে তার পছন্দ মতো পুরুষ পাখির কাছে গিয়ে ধরা দেয়। কখনো কখনো একটি পুরুষকে অধিকার করার জন্য দুটি মেয়ে পাখির মধ্যে সেই চিরন্তন প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়। পুরুষটি কোনো পক্ষ অবলম্বন না করে বিজয়িনীর জন্য অপেক্ষা করে।

গৃহকাজে ব্যস্ত অথচ ঘরণীকে দরকার এই অবস্থায় পুরুষ পাখি গান গেয়ে তার বক্তব্য বুঝিয়ে দেয়। অনেক সময় স্ত্রী-সংগ্রহে ব্যর্থ কোনো পুরুষ পাখি নিজের দুঃখময় জীবনের পরিত্রাণের জন্য অন্য কোনো যুগলের বাসস্থানে চুপি চুপি প্রবেশ করে ঐ ঘরণীকে আকর্ষণ করার চেষ্টা করে। কিন্তু সদা জাগ্রত স্বামীটি কিছু বিপদ ঘটার আগেই দ্রুতলয়ে, তীব্রস্বরে গান গেয়ে উঠতেই অনুপ্রবেশকারী ঐ স্থান ছেড়ে উড়ে যায়।

ডিম পাড়ার পর থেকে পুরুষ পাখির গানের আর প্রয়োজন না থাকায় তা ধীরে ধীরে কমে যায়। তখন শুধুমাত্র টেরিটরি রক্ষার জন্য গান দরকার হয়। বাচ্চাদের নীড় পরিত্যাগের পর প্রায় সব পাখির গান বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু কোনো কোনো প্রজাতির পাখি প্রজনন ঋতুর পরও গান গেয়ে থাকে অনুমান করা হয়েছে যে দাম্পত্য সম্পর্ক রক্ষা করাই এই গানের উদ্দেশ্য আমাদের দেশের বিশিষ্ট কয়েকটা গায়ক পাখির নাম পরিশিষ্টে (১০) দেওয়া হলো।

২। পাখি কেন উড়ে যায় দেশে দেশান্তরে

প্রাচীনকাল থেকেই পরিযায়ী পাখি মানুষের কল্পনাকে রোমাঞ্চিত করেছে। মানুষ অবাক বিস্ময়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখেছে যে বছরের কোনো এক সময়ে হাজার হাজার পাখি কোথা থেকে উড়ে এসে সমস্ত আকাশকে কালো মেঘের মতো করে ঢেকে ফেলে। বিস্ময়ের ঘোর কাটার আগেই মানুষ দেখলো পাখিরা যেন কোথায় মিলিয়ে গেছে। প্রায় দু-হাজার বছর ধরে পাখিদের এই সাময়িক যাওয়া-আসাকে ঘিরে মানুষের মনে অনেক কুহেলিকা ও জিজ্ঞাসা দানা বেঁধে উঠেছে। ফলে পাখির পরিযায়ী বৃত্তি নিয়ে বহু কাহিনী, কাব্য-সাহিত্য ও বৈজ্ঞানিক তথ্যের অবতারণা হয়েছে।

পরিযায়ী প্রবৃত্তি পাখির জীবনের এক বিপদ সঙ্কুল অভিযান। কেননা

দেশান্তরে যাওয়া-আসার পথে হাজার হাজার পাখি প্রতি বছর মৃত্যুবরণ করে। পাখি কেন যে দেশান্তরে গমন করে তা এখনও রহস্যের মধ্যেই রয়ে গেছে।

অনেকে মনে করেন যে প্লাইয়োসটোসিন হিমযুগে পৃথিবীর উত্তর ভূখণ্ড বরফে ঢেকে যাওয়ায় বাঁচার তাগিদে পাখি ঐ স্থান পরিত্যাগ করে দক্ষিণ ভূখণ্ডে চলে যেতে বাধ্য হয়। ঐ অবস্থার পরিবর্তনের পর পাখি আবার নিজ ভূখণ্ডে ফিরে আসে। এবং স্থানান্তরে যাওয়া-আসা তার জীবনে এই ভাবে জন্ম নেয়। কিন্তু কার্যত এই বক্তব্য মেনে নিতে অনেক বাধা আছে। কেননা ভৌগোলিক তথ্য থেকে জানা গেছে যে প্লাইয়োসটোসিন হিমযুগের বহু পূর্ব থেকেই পাখিপরিযায়ী হতো। তাছাড়া ঐ যুগে যেসব স্থান বরফে আবৃত হয়নি সেখান থেকেও পাখি দেশান্তরে রওনা হতো।

আবার অনেকে মনে করেন পাখির আদি বাসস্থান দক্ষিণ ভূখণ্ডে। কোনো কারণে এক সময় পাখি বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং উত্তর গোলার্ধে খাদ্যের প্রাচুর্যের ফলে ঐ স্থানে থেকে যায়। কিন্তু শীত আরম্ভ হলে তারা আবার অন্যত্র চলে যেত। যেসব পাখি শীতের সময় ঐ স্থান ত্যাগ করলোনা তারা নিশ্চিহ্ন হল। যারা চলে গিয়েছিল গ্রীষ্মের আরম্ভে উপযুক্ত খাদ্য সংগ্রহের জন্য আবার উত্তর গোলার্ধে ফিরে এলে। অনুমান করা হয়েছে যে এই ভাবেই পাখির পরিযায়ী প্রবৃত্তির সূচনা হয়।

আর-একটি তথ্যে বলা হয়েছে যে দক্ষিণের গণ্ডোয়ানা দেশে উদ্ভুত পাখি খাদ্যের সন্ধানে দূর-দূরান্তে যাতায়াত করতো। কালক্রমে ঐ ভূখণ্ড যখন টুকরো টুকরো হয়ে একে অন্যের কাছ থেকে বহু দূরে চলে গেল তখন পাখি ঐ অবস্থাকে মানিয়ে নিয়ে উত্তর ভূখণ্ডের বিভিন্ন স্থানে বসবাস আরম্ভ করে ওখানেই প্রজনন করতে আরম্ভ করলো। কিন্তু শীতকালে দক্ষিণ ভূমণ্ডলের দেশগুলিতে ফিরে আসার রীতি বজায় রাখল। এছাড়া অত্যাধিক শীত ও খাদ্যের অভাব জনিত কারণে পাখির পরিযায়ী বৃত্তি আরম্ভ হয়েছিল বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু এ রহস্যের এমন কোনো সমাধান হয়নি।

পরিযান উদ্দীপনা : প্রতি বছর প্রায় একই সময়ে পরিযায়ী পাখি দেশান্তরে রওনা হওয়ার জন্য কোথা থেকে এবং কী ভাবে উদ্দীপনা পায় তা আজও সঠিক ভাবে বলা যাবে না। তবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যেসব তথ্য পাওয়া গেছে তার কিছু আলোচনা করা যেতে পারে। দেখা গেছে যে দিনের আলো উত্তর গোলার্ধে যখন কমতে থাকে এবং পাখির যৌন-গ্রন্থি নিষ্ক্রিয় হতে

থাকে তখন ওরা দেশান্তরে রওনা হওয়ার জন্য চঞ্চল হয়। গ্রীষ্ম আরম্ভে যৌন-গ্রন্থির কার্যকারিতা আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাখি তাদের শীতাবাস ত্যাগ করে গ্রীষ্মাবাসে ফিরতে আরম্ভ করে। এ তথ্য মেনে নিতে কিছু অসুবিধা আছে। কেননা বিষুবরেখার নিকটবর্তী স্থানে যেখানে বছরের সব সময়েই দিনের আলোর পরিমাণ প্রায় সমান থাকে সেখানেও প্রজনন ঋতুর পর পাখি স্থান ত্যাগ করে থাকে। অনেকে মনে করেন থাইরয়েড গ্রন্থির কার্যকারিতা বৃদ্ধির ফলে পাখি দেশান্তরে পাড়ি দেবার প্রেরণা পায়। দেশান্তরে রওনা হওয়ার আগে পাখির শরীরে প্রচুর চর্বি জমা হয়। তাই অনেকে মনে করেন এরই ফলে পাখি উত্তেজিত হয়ে পরিযায়ী হয়। দিনরাতের তারতম্যের জন্য আভ্যন্তরিক শারীরিক প্রক্রিয়ায় কিছু পরিবর্তন আসে। এর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পিটুইটারি গ্রন্থি যৌন-গ্রন্থিকে উত্তেজিত করে এবং পাখি ঐ অবস্থাকে মানিয়ে নেবার জন্য সচেষ্ট হয়। এই রকম শারীরিক অবস্থায় সামান্যতম প্রাকৃতিক পরিবর্তন, যথা, উষ্ণতা, আবহাওয়া, খাদ্যের অভাব প্রভৃতি কারণ উপস্থিত হলে পাখি ঐ স্থান ত্যাগ করার জন্য প্রভাবিত হয় বলে অনেকের ধারণা।

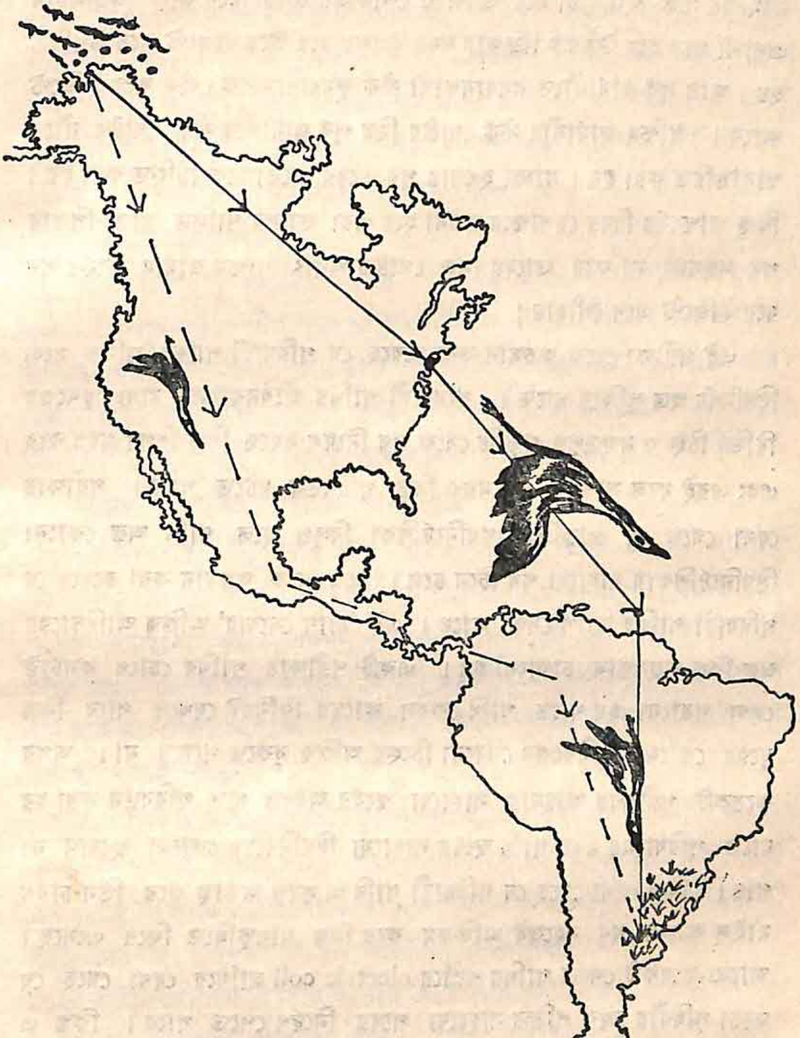
পাখির পরিযায়ী বৃত্তির মধ্যে সবচেয়ে আশ্চর্যজনক বিষয় হচ্ছে তার দিগনির্ণয়ের দক্ষতা। পাখি কী করে হাজার হাজার মাইল পথ অতিক্রম করে প্রতি বছর নিজ বাসভূমি থেকে তার শীতাবাসে যাতায়াত করে তা আজও নির্ণয় হয়নি। পাখির দিগনির্ণয়ের প্রকৃত স্বরূপ আবিষ্কার করার জন্য এই শতাব্দীর প্রথম থেকে নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা আরম্ভ হয়—

১৮৮২ সালে ভিগিয়ের প্রস্তাব করেন যে পৃথিবীর চুম্বক শক্তির প্রাবল্যতার চরম পর্যায় অনুধাবন করে পাখি দেশান্তরে যাবার সময় দিগনির্ণয় করে। ১৯৪৬ সালে ইয়েগুলিও চৌম্বক তত্ত্বের বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখান যে চৌম্বক শক্তির গতি-প্রকৃতি অনুধাবন করার উপায় বন্ধ করে দিলে পাখি বিহ্বল হয়ে পথ হারিয়ে ফেলে। তিনি এই তত্ত্বে উপনীত হন যে পাখিরা ভূচৌম্বক ক্ষেত্র সম্বন্ধে সংবেদনশীল এবং তারা এর পরিমাপ করতেও সক্ষম। ঐ বছরেই আইসিং দেখান যে পৃথিবীর আবর্তনের ফলে যে গতি উৎপন্ন হয় পাখিরা তার পরিমাপ করতে পারে এবং তারা ভূ-পৃষ্ঠের সঙ্গে নিজেদের গতির সম্বন্ধ-স্থাপনকেও হিসেব করতে পারে। হিচেট ও অন্যান্য কয়েকজন বৈজ্ঞানিক মনে করেন যে পাখিরা তাদের গন্তব্যস্থানকে হয় দূর থেকে দেখতে

পায় অথবা অন্য কোনো উপায়ে তার হদিস পায়। wojtusiak মনে করেন যে পরিযায়ী পাখি ইনফ্রারেড আলোর সাহায্যে পথ দেখে নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হয়। গ্রিফেন-এর মতে পাখি ভূ-ভাগের নানা পরিচিত নিদর্শন অনুসরণ করে গন্তব্যস্থানে উপস্থিত হয়। ক্রেমার পরীক্ষার সাহায্যে দেখেন যে পাখিরা পরিযানের সময় সূর্যের কৌণিক অবস্থান থেকে নিজেদের পথ ঠিক করে। কিন্তু নানা পরীক্ষার সাহায্যে সূর্যের কৌণিক অবস্থান পরিবর্তন করেও দেখা গেছে যে পাখি দিক্‌ভ্রান্ত না হয়ে নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হয়েছে। এছাড়া পরিযানের সময় পাখিদের চোখে কনট্যাক্ট লেন্স পরানো হয়েছে, যাতে তারা শুধু কাছের বড় জিনিস দেখতে পায়। তা সত্ত্বেও দেখা গেছে যে পরিযায়ী পাখি ঠিক পথে উড়ে চলে। কয়েক বছর আগে এমলেন পরীক্ষা করে এ তত্ত্বে উপনীত হন যে রাতে পরিযানের সময় পাখি ধ্রুবতারা ও অন্যান্য নক্ষত্র লক্ষ্য করে এগিয়ে চলে। সম্প্রতি পাপি পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করেন যে পাখি তাদের গন্তব্য স্থানের নির্দিষ্ট গন্ধের ঘ্রাণ গ্রহণ করে পথ চলে থাকে।

বর্তমানে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা গেছে যে পরিযায়ী পাখির দিগনির্ণয়ের ক্ষমতা সহজাত প্রবৃত্তির অন্তর্গত। গোল্ডেন প্লোভার পাখি উত্তর আমেরিকার মেরু অঞ্চলে ডিম পাড়ে। বাচ্চাদের বয়স যখন প্রায় এক মাসের মতো হয় তখন ওখানকার সমস্ত পূর্ণবয়স্ক প্লোভাররা মেরু অঞ্চল পরিত্যাগ করে বাঁকা পথে দক্ষিণ-পূর্বে রওনা হয়। প্রায় ৩০০০ মাইল পথ পরিক্রমার পর পাখিরা আটলান্টিক উপকূলের Nova scotia-তে উপস্থিত হয়। এবং সেখান থেকে আটলান্টিক মহাসাগর পার হয়ে সোজা দক্ষিণ আমেরিকার আরজেনটেনিয়ার তৃণভূমিতে উপস্থিত হয়। পূর্ণবয়স্ক পাখিদের মেরু অঞ্চল ত্যাগের প্রায় একমাস পরে সেই বছরে জন্মগ্রহণ করা (বয়স প্রায় এক থেকে তিন মাস) সমস্ত 'শিশু' প্লোভার দেশান্তরে রওনা হয়। কিন্তু এরা তাদের মাতা-পিতার পরিযানের পথ গ্রহণ না করে আমেরিকা ভূ-খণ্ডের উপর দিয়ে দক্ষিণে এণ্ডিজ পর্বতমালা অতিক্রম করে সোজা আরজেন্টেনিয়ার তৃণভূমিতে গিয়ে মাতা-পিতার সঙ্গে মিলিত হয়। দক্ষিণ আমেরিকায় গ্রীষ্ম শেষ হলে সমস্ত পূর্ণবয়স্ক প্লোভার ও বাচ্চার দল একই সঙ্গে তাঁদের গ্রীষ্মকালীন আবাসের দিকে রওনা হয়। ফেরার পথে সমস্ত প্লোভার পাখি জলাভূমির উপর দিয়ে না উড়ে বাচ্চাদের উড়ে আসার পথ ধরে উত্তর আমেরিকার মেরু অঞ্চলে ফিরে যায়। পরের বছর এ বছরের বাচ্চারা

পূর্ণবয়স্ক হয়ে পড়ে কাজেই আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে দক্ষিণ আমেরিকায় আসে। দেশান্তরে যাবার পথনির্দেশিকা কতখানি সহজাত প্রবৃত্তির দ্বারা



চিত্র নং ৭—গোল্ডেন প্লোভারের পরিযান পথ
(ক) ভাঙ্গা রেখা—শাবক (খ) পূর্ণ রেখা—পূর্ণ বয়স্ক

চালিত আর কতখানিই বা শেখা তা জানার জন্য কয়েকটি পরীক্ষা চালানো হয়। একই প্রজাতির স্টর্ক পশ্চিম ও পূর্ব জার্মাণীতে বসবাস করে। পশ্চিম জার্মাণীর স্টর্ক পরিযায়ী হয়ে ফ্রান্স ও স্পেন-এর উপর দিয়ে উড়ে জিব্রাল্টার প্রণালী পার হয়ে উত্তর আফ্রিকার সমুদ্র উপকূল ধরে উড়ে ইজিপ্টে এসে উপস্থিত হয়। আর পূর্ব জার্মানীতে বসবাসকারী স্টর্ক ভূমধ্যসাগরকে বেষ্টন করে ইজিপ্টে আসে। পশ্চিম জার্মানীর স্টর্ক গোষ্ঠীর ডিম পূর্ব জার্মানীর স্টর্ক গোষ্ঠীর নীড়ে স্থানান্তরিত করা হয়। বাচ্চা হওয়ার পর এদের প্রত্যেককে চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় দেশান্তরে রওনা হয়ে এরা তাদের পালিত মাতা-পিতার পথ অনুসরণ না করে তাদের নিজ গোষ্ঠীর অর্থাৎ পশ্চিম জার্মান স্টর্কের পথ ধরে ইজিপ্টে এসে পৌছায়।

এই পরীক্ষা থেকে অনুমান করা হয়েছে যে পরিযায়ী পাখির স্মৃতির মধ্যে দিগনির্ণয় সূত্র লুকিয়ে থাকে। পরিযায়ী পাখির জীবনকালের মধ্যে ভূখণ্ডের বিভিন্ন চিহ্ন ও নক্ষত্রপুঞ্জ প্রভৃতি থেকে পথ নির্দেশ সম্বন্ধে কিছু শিক্ষা গ্রহণ করে এবং এরই ফলে সহজাত জ্ঞানেরও কিছু পরিবর্তন ঘটতে পারে। পরীক্ষায় দেখা গেছে যে প্রাকৃতিক পথনির্দেশিকা বিলুপ্ত হলে পাখি অন্য কোনো দিগনির্দেশিকার সাহায্যে পথ চিনে চলে। এর থেকে অনুমান করা হয়েছে যে পরিযায়ী পাখির 'ম্যাপ সেন্স' আছে। এই 'ম্যাপ সেন্সের' অস্তিত্ব আবিষ্কারের জন্য কিছু অনুসন্ধান চালানো হয়। একটি পরীক্ষায় পাখির চোখে কনটাক্ট লেন্স পরানো হয় যাতে পাখি কেবল কাছের জিনিষই দেখতে পাবে কিন্তু দূরের কোনো ভূমিখণ্ডের কোনো চিহ্নের অস্তিত্ব বুঝতে পারবে না। অপর কয়েকটি পরীক্ষায় আয়নার সাহায্যে সূর্যের আপত গতি পরিবর্তন করা হয় যাতে পরিযানের সময় পাখি সূর্যের সাহায্যে দিগনির্ণয়ের কোনো সুযোগ না পায়। কিন্তু দেখা গেছে যে পরিযায়ী পাখি এ সমস্ত অগ্রাহ্য করে তিন-চারশ মাইল অজানা পথ সহজেই অতিক্রম করে নিজ বাসভূমিতে ফিরে এসেছে। আরও কয়েকটি ক্ষেত্রে পাখির শরীরে electric coil লাগিয়ে দেখা গেছে যে তারা পৃথিবীর চুম্বক শক্তির সাহায্যে পথের নির্দেশ পেতে পারে। কিন্তু এ থেকে জানা সম্ভব হয়নি যে পরিযায়ী পাখির 'ম্যাপ সেন্স' কী করে তাদের গন্তব্য স্থানের হদিস দেয়। অতি সম্প্রতি ডঃ পিট গ্রিউ ও ডঃ প্রেসটি পায়রার গলার পেশীতে চুম্বক পদার্থ ম্যাগনেটাইটের সন্ধান পেয়েছেন যা পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র অনুভবের রিসেপটার হিসাবে কাজ করে। এর সাহায্যে পায়রা

ঘূর্ণায়মান পৃথিবীর বেগ ও চৌম্বক ক্ষেত্র অনুধাবন করতে পারে। পৃথিবীর চৌম্বক মেরু ও চৌম্বক মধ্যরেখার মধ্যে চৌম্বক শক্তির ক্রমান্বয় পরিবর্তন ঘটে এবং বিভিন্ন স্থানে তার মানও আলাদা। কাজেই উড়ন্ত পায়রা ম্যাগনেটাইটের সাহায্যে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের চৌম্বক শক্তির মান অনুধাবনের সাহায্যে তার সঠিক অবস্থান কোথায় তা নির্ভুলভাবে জানতে পারে।

পাখির শরীরে ম্যাগনেটিক রিসেপটার আবিষ্কারের ফলে পরিযায়ী পাখির দিগনির্ণয় রহস্য তার 'জিওম্যাগনেটিক ম্যাপ সেন্সের' মধ্যে আছে বলে বর্তমানে কিছু বিজ্ঞানী মনে করেন।

পাখির পরিযায়ী প্রবৃত্তির উদ্ভবের সঙ্গে তার দেহে নানা পরিবর্তন দেখা দেয়। বাধাহীনভাবে দীর্ঘ সময় আকাশে ওড়ার জন্য পাখির ডানা লম্বা ও সরু হয়ে রূপান্তরিত হয়। তাছাড়া ডানা যাতে ক্ষণভঙ্গুর না হয়ে পড়ে তার জন্য বাইরের 'প্রাইমারি' সবচেয়ে লম্বা ও পরবর্তী প্রাইমারিগুলি ক্রমে ক্রমে ছোট হয়ে গেল। এই রূপান্তরে পাখি আরও গতিশীল হল।

বিভিন্ন যন্ত্রপাতির সাহায্যে জানা গেছে যে পরিযায়ী পাখি সাধারণত ১৩০০–৩০০০ ফুট উঁচু দিয়ে উড়ে যায়। সারস, শকুন প্রভৃতি পাখিকে ১৯০০—২০০০ ফুট উঁচু দিয়ে মাঝে মাঝে উড়ে যেতে দেখা যায়। কয়েক বছর আগে দেরাদুনের কাছে একদল হাঁসকে ২৯,০০০ ফুট উঁচু দিয়ে উড়ে যেতে দেখা যায়। এখন পর্যন্ত উঁচুতে ওড়ার এটাই সর্বোচ্চ রেকর্ড। কিন্তু পাখি কি করে এত উচ্চতায় অক্সিজেন স্বল্পতার সমস্যা সমাধান করে তা এখনও রহস্যের মধ্যেই আছে।

স্বাভাবিক অবস্থায় পরিযায়ী পাখির ওড়ার গতি তার ব্যক্তিগত ক্ষমতা ও ভূখণ্ডের অবস্থার উপর নির্ভর করে। দেখা গেছে সাধারণত পাখি ঘণ্টায় ৪০-৪৫ মাইল বেগে উড়তে পারে। এমন অনেক পরিযায়ী পাখি আছে যারা পরিযানের সময় মধ্যবর্তী কোনো স্থানে না থেমে বহুদূর পাড়ি দিতে পারে। যেমন ইস্টার্ন গোল্ডেন প্লোভার জাপান থেকে অষ্ট্রেলিয়া পর্যন্ত সুদীর্ঘ দু-হাজার মাইল পথ না থেমে অতিক্রম করে। পূর্ব হিমালয় অঞ্চল থেকে দক্ষিণে নীলগিরি পাহাড় পর্যন্ত দীর্ঘ দেড় হাজার মাইল পথ কোথাও না থেমে উডকক পাখি অনায়াসে উড়ে আসে।

উত্তর মেরুর টার্ন (Arctic tern)-এর পরিযায়ী প্রবৃত্তি প্রাণীজগতে এক বিস্ময়কর ঘটনা। এই ছোট পাখি প্রতি বছর উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু যায়

এবং আবার ওখান থেকে ফিরে যায়। এই পথ পরিক্রমায় তাকে প্রায় বাইশ হাজার মাইল পথ অতিক্রম করতে হয়। এ ছাড়া আরও কয়েকটি পাখি যেমন গোল্ডেন প্লোভার ও টাসমেনিয়ার মাটনবার্ড প্রতি বছর প্রায় পনের-ষোল হাজার মাইল পথ অতিক্রম করে। প্রায় শতাব্দীকাল ধরে নানারকম গবেষণার দ্বারা যদিও আমরা পরিযায়ী পাখির অনেক অজানা কথা জানতে পেরেছি, তবুও ওদের জীবনের আসল রহস্য, অর্থাৎ পরিযায়ী প্রবৃত্তির সূচনা, বাৎসরিক পরিযানের জন্য উত্তেজনা ও দিগনির্ণয়ের রহস্য আজও আমাদের কাছে ধরা দেয় নি।

৩। আত্মহননের বহ্নি উৎসবে

অপূর্ব পার্বত্যসুষমার কুহেলিকায় ঢাকা জাতিঙ্গা গ্রাম আসামের হাফলং শহরের দক্ষিণে বরাইল পাহাড়ের উপরে অবস্থিত। ঐ গ্রামে প্রতি বছর একটি বৈশিষ্ট্যজনক ঘটনা ঘটে। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসের কৃষ্ণপক্ষের রাতে কৃত্রিম আলোক উৎস রাখা হলে দলে দলে পাখি ঐ আলোক উৎসের প্রতি ছুটে এসে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে। জাতিঙ্গার এই পাখি রহস্য বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকদের কাছে এক দুরন্ত চ্যালেঞ্জ।

জয়ন্তীয়া উপত্যকার উত্তর দক্ষিণে রয়েছে কাছার সমভূমি। হাফলং শহর এই উপত্যকায় অবস্থিত। শহরটির কিছু দক্ষিণে বরাইল পর্বতমালা শিলং মালভূমির দক্ষিণ সীমান্ত থেকে বেরিয়ে পূর্ব দিক বেয়ে ক্রমশঃ উপরের দিকে খাড়াই হয়ে উঠে গেছে। উচ্চ থেকে উচ্চতর পথে এগিয়ে বারাইল পাহাড় ইন্দোবর্মার সীমান্তে লুসাই পর্বতে যুক্ত হয়েছে। হাফলং শহরের দক্ষিণে ৭৩৬ মিটার উঁচুতে ঐ জাতিঙ্গার গ্রামের অবস্থান। গ্রামের সীমানা দুই-বর্গ কিলোমিটারে কিছু বেশী। লোকের সংখ্যা প্রায় বারশ। পার্বত্য ভূমিতে গ্রামবাসীরা কমলা লেবু, আনারস চাষ করে থাকে।

১৮৯৫ সালে ইউ-লোকান-বাং সুচিয়াং নামে জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি জয়ন্তীয়া রাজ্যের পুরাতন রাজধানী জয়ন্তীয়াপুর পরিত্যাগ করে জাতিঙ্গা গ্রামের প্রতিষ্ঠা করে বসবাস আরম্ভ করেন।

সংগৃহীত তথ্য থেকে জানা যায় যে ১৯০৫ সালের এক অন্ধকার রাতে ঐ গ্রামের কিছু লোক একটা হারিয়ে যাওয়া মোষের সন্ধানে মশাল হাতে বের হয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ পর তারা অবাক হয়ে দেখলো যে শ'য়ে শ'য়ে পাখি তাদের

ঘিরে ফেলেছে। গ্রামবাসীরা ভাবলো তাদের খিদের জ্বালা মেটানোর জন্য ঈশ্বরই এখানে এই পাখিগুলিকে পাঠিয়েছেন।

আলোর প্রতি পাখিদের আকর্ষণের রহস্য উদ্ধারের জন্য ১৯৭৭ সালে লেখক সর্বপ্রথম সমীক্ষা আরম্ভ করেন—যা আজও অব্যাহত আছে। ১৯৭৭ সালের অক্টোবর মাসে তিনি জাতিঙ্গায় উপস্থিত হন। ওখানে কয়েকদিন সমীক্ষা চালিয়ে তিনি কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য পেলেন। ঐ তথ্যের উপর ভিত্তি করে এক ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ অন্ধকার রাতে বাইরে বেরিয়ে একটা জায়গা বেছে নিলেন। তাঁরা ঐ স্থানে প্রায় দেড় মিটার দীর্ঘ একটা বাঁশ মাটিতে পুঁতে তার মাথায় একটা জলন্ত পেট্রোম্যাক্স ঝুলিয়ে দিলেন। রুদ্ধশ্বাসে দশ পনের মিনিট অপেক্ষা করার পর এক ঝাঁক পাখিকে উত্তর দিক থেকে উড়ে আসতে তাঁরা দেখলেন। ঐ পাখির দল উর্ধাকাশে কয়েক মিনিট চক্রাকারে ঘুরে অচঞ্চলভাবে নিচের আলোকিত জায়গায় নেমে এলো। কিছুক্ষণের মধ্যে আরও একদল পাখি আলোকস্তম্ভের উপর এসেই সোজা মাটিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এরা উড়ে পালাবার কোনো চেষ্টাই করল না। জড়সড় হয়ে কাছাকাছি বসে রইল। মনে হলো, তারা সম্মোহিত হয়ে পড়েছে। সেদিন প্রায় এক ঘণ্টা সমীক্ষা চালিয়ে লেখক ও তার দলের লোকেরা অন্য আর-এক স্থানে একইভাবে পেট্রোমাক্স জ্বালিয়ে দিলেন। তখন রাত প্রায় বারোটা, ঝড়বৃষ্টির দাপটও বেশ চলছে। বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দ ও গাছপালার মর্মরধ্বনি সমস্ত পরিবেশকে উত্তাল ও অশান্ত করে তুলেছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁরা অপার বিস্ময়ে ঐ ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখলেন—উত্তর দিক থেকে উড়ে আসা পাখির দল নিঃশব্দে নিচের আলোকিত জায়গায় নেমে এলো। সে রাতে এইভাবে আরও কয়েকটি জায়গায় সমীক্ষা চালিয়ে তাঁরা রাত তিনটের সময় ক্যাম্পে ফিরে আসেন। এই ভাবে বেশ কয়েকটি রাত সমীক্ষা চালিয়ে পাখিদের আলোক উৎসের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার কারণ অনুসন্ধান তাঁরা করেছিলেন।

একদিন রাত সাতটার সময় লেখক বারান্দায় অপেক্ষা করছেন। ওখানে একটা একশ ওয়াটের বাল্ব জলছিল। বাইরে জোরালো ঝড়-বৃষ্টি; হঠাৎ একটা পাখি বারান্দায় উড়ে এসে স্থির হয়ে বসে রইল। পাখিটাকে তুলে লেখক একটা লম্বা টেবিলের উপর রাখেন। পাখিটার নাম, হলদে বিটার্ন। পাখিটি ঘাড় উঁচু করে টেবিলের উপর চলাফেরা করতে লাগল। সমীক্ষা শেষে

রাত দুটোর সময় ফিরে তাঁরা দেখেন যে পাখিটি জেগে বসে আছে। পরের দিন সকাল বেলায় তাকে পর্যবেক্ষণ করার জন্য বাইরে ছেড়ে দিলেন। পাখিটি ধীর পদক্ষেপে কাছাকাছি ঘুরতে লাগল। ঘণ্টা খানিক ওর আচরণ লক্ষ্য করে ওকে ঘরে তুলে আনলেন। ঐ দিন রাতে বারান্দায় আর একটা নতুন অতিথি উড়ে এল। ওর নাম তিন-আঙ্গুলি মাছরাঙা। অত্যন্ত সুন্দর চেহারা। নতুন অতিথিকে তারা হলদে বির্টানের সঙ্গে এক টেবিলে রেখে দিলেন। পরের দিন সকাল বেলায় পাখি দু-টি কখনও বা মাটিতে কখন বা টেবিলে ঘুরে বেড়াতে লাগল। ওদের খাওয়াবার সব চেষ্টা ব্যর্থ হলো। অভুক্ত অবস্থায় পাখি দু'টি কদিন কাটিয়ে লেখকের সঙ্গে বাসে করে শিলং যাত্রা করলো। তার এক সহকর্মীর হাতে বসেই পাখি দু'টি চলতে লাগলো। প্রায় পাঁচ ঘণ্টা চলার পর ঐ সহকর্মীর হাতের উপরেই পাখি দু-টি চিরকালের মতো ঘুমিয়ে পড়লো।

কয়েক বছর ধরে জাতিঙ্গার বিভিন্ন স্থানে ও বিভিন্ন প্রাকৃতিক অবস্থায় পাখিদের এই রহস্যজনক আচরণ নিরীক্ষণ করে তাঁরা বুঝতে পারলেন, যে কোনো অন্ধকার রাতে আলো জ্বালালেই পাখির দল জাতিঙ্গার গ্রামে ধেয়ে আসবে না। কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর লেখক এই সিদ্ধান্তে এলেন যে কৃত্রিম আলোর দিকে পাখিদের আকর্ষণের জন্য কয়েকটি প্রাকৃতিক ঘটনার সমাবেশ অপরিহার্য :

১। আকাশ থাকবে ঘন কুয়াশায় আচ্ছন্ন।

২। ঘোর অন্ধকার রাত।

৩। যথেষ্ট পরিমাণে বৃষ্টিপাত।

৪। ঐ অঞ্চলটির দক্ষিণ থেকে ৩০-৪০ কিলোমিটার বেগে বাতাস প্রবাহিত হওয়া প্রয়োজন।

বিভিন্ন প্রকৃতিক অবস্থায় তাঁরা সমীক্ষা চালিয়ে দেখেছেন যে ঐ সব কটি শর্তের একটিও যদি অনুপস্থিত থাকে, তবে ঝাঁকে ঝাঁকে তো দূরের কথা, একটা পাখিও আলোতে ঝাঁপ দেবে না। অন্য দিকে ঝড়-বৃষ্টি যত হবে, তত বেশি পাখি আলোক উৎসের প্রতি ধাবিত হবে। আবার জাতিঙ্গা গ্রামের যে কোনো জায়গায় ঐ ঘটনা ঘটবে না। একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে যথা—জাতিঙ্গা রেল স্টেশন ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মধ্যবর্তী স্থানেই পাখির দল আলোক উৎসের প্রতি ধাবিত হবে।

জাতিঙ্গায় পাখিদের এই বৈশিষ্ট্যসূচক আচরণের অভিনবত্বের ক্ষেত্রে কতকগুলি প্রশ্ন উঠতে পারে। যেমন—অন্ধকার রাতের প্রয়োজন কী? কেনই বা কুয়াশার পর্দায় ঢাকা আলোক উৎসের প্রতি পাখিদের এই দুর্নিবার আকর্ষণ? রাতের অন্ধকারে পাখিরা পথই দেখে কী করে? এ ছাড়া বর্ষা মুখর রাত ও বাতাসের বিশেষ একদিকে প্রবাহের প্রয়োজনীয়তাই বা কী? আবার ঐ অঞ্চলটির প্রতি পাখিদের আকর্ষণ হয় কেন? আবার আলোকিত স্থানে আসার পর পাখিরা সম্মোহিতই বা হয় কেন? এবং কেবলমাত্র সেপ্টেম্বর—অক্টোবর মাসেই কেন এ ঘটনা ঘটবে?

কিসের আকর্ষণে দলে দলে পাখি প্রতি বছর বর্ষামুখর রাতে একটা নির্দিষ্ট স্থানে আলো দেখে ঝাঁপিয়ে পড়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করছে তার সঠিক কারণ এখনও লেখক নির্ণয় করতে পারেন নি। তবে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে কয়েকটি সম্ভাবনার কথা বলা চলে—

১। বৃষ্টি ও ঝড়ো হাওয়ার দাপটে পাখিদের নিদ্রা বিঘ্নিত হয় এবং তারা বিব্রত বোধ করে। অন্যান্য প্রাণীর মতো পাখিও অনাহারে তীব্র অস্বস্তি বোধ করে। এই প্রতিক্রিয়ার ফলে তারা আলোর প্রতি অদ্ভুতভাবে আকৃষ্ট হয়। জাতিঙ্গায় পাখিদেরও এই অবস্থায় পড়তে হয়। কারণ আলোক ধারায় আকৃষ্ট হবার প্রায় চার-ঘণ্টা আগে ঐ অঞ্চলের পাখিরা তাদের দিনের শেষ আহার গ্রহণ করে থাকে। ঐরূপ শারীরিক ও পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার মধ্যে পাখিরা ভীত হয়ে পড়ে এবং আলোক ধারার উদ্দেশ্যে উন্মত্ত হয়ে ছুটে চলে।

২। যেহেতু বিশেষ পারিপার্শ্বিক অবস্থার দ্বারা ভূগর্ভের জলধারার চুম্বক শক্তিতে অকস্মাৎ পরিবর্তন ঘটা সম্ভব সেই কারণে ঘনবর্ষায় চুম্বক শক্তির পরিবর্তিত প্রভাবের ফলে পাখিদের ব্যবহারিক ছন্দে পরিবর্তন ঘটাও খুবই স্বাভাবিক। এর ফলস্বরূপই হয়তো পাখিরা যন্ত্র চালিতের মতো ঐ উৎস সন্ধানে জোটে।

৩। কোনো স্থানের আবহাওয়া পরিবর্তনের সঙ্গে বায়ুমণ্ডলের তড়িৎ-প্রাবল্যের তারতম্য ঘটে। ঝড়-বৃষ্টির সময় ঐ তড়িৎ-প্রাবল্যের প্রখরতা বেড়ে যায় এবং তার প্রভাবে পাখির আচরণের পরিবর্তন ঘটে। ফলে পাখি দৃশ্য বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সেই দিকে ছুটে চলে। ঝড়ের সময় বায়ুমণ্ডলে electrical distance বেড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে জাতিঙ্গার ঐ নির্দিষ্ট স্থানে পাখিদের আগমন সংখ্যায়ও বেড়ে যেতে দেখা গেছে।

৪। জাতিঙ্গার ঐ সময়ের প্রাকৃতিক অবস্থার সামগ্রিক রূপটা দৃষ্টির মাধ্যমে পাখির স্নায়ুতন্ত্রের উপর উত্তেজনা সৃষ্টি করে। ফলে তারা দৃশ্য বস্তুর প্রতি ছুটে চলে।

৫। আলোকিত স্থানে পৌছাবার সঙ্গে সঙ্গে পাখিরা 'সম্মোহিত' হয়ে পড়ে। আলোকরশ্মির দ্বারা পাখিদের স্নায়ুমণ্ডল ক্রমাগত উত্তেজিত হবার ফলে তাদের চলাচল ক্ষমতা রহিত হয়ে যায়।

লেখক মনে করেন এ রহস্যের আবরণ উন্মোচন করতে এখনও তাকে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হবে। [পরিশিষ্ট—১১]

অষ্টম পরিচ্ছেদ

জানা-অজানা

১। সন্তান পালনে অন্যান্য পন্থা

পাখির খাদ্যনালীর যে অংশকে ইসোফেগাস বলা হয়, খাদ্য সংগ্রহ করে রাখার জন্য তা অনেক সময় নানা ভাবে রূপান্তরিত হয়। বিশেষ ভাবে রূপান্তরিত ঐ অংশকে ক্রপ বলা হয়। পায়রা ও ঘুঘুর ক্রপ এক বিস্ময়কর কাজ করে, যা আর কোনো পাখির মধ্যে দেখা যায় না। প্রজনন ঋতুতে পুরুষ ও মেয়ে পায়রার ক্রপ থেকে এক রকম রসাল দ্রব্য তৈরী হয় যা 'পিজিয়ান মিল্ক' নামে পরিচিত। প্রজনন ঋতুতে ক্রপের স্কোয়ামাস এপিথিলিয়াম কোষে চর্বির আধিক্য দেখা যায়। ডিম পাড়ার অষ্টম দিন থেকে ঐ চর্বিযুক্ত এপিথিলিয়াম কোষগুলি ক্রপের গা থেকে খসে পড়ে এবং সেগুলি তখন ক্রপের ভেতরে অবস্থিত খাদ্যাংশের সঙ্গে মিশে গিয়ে যা তৈরি করে তাই 'পিজিয়ান মিল্ক' বা পায়রার দুধ। পাখি ডিমে তা' দেওয়া আরম্ভ করার ১৪ দিন থেকে ঐ দুধের সরবরাহ আরম্ভ হয় এবং বাচ্চার জন্মের ১৬ দিন পর্যন্ত দুধের সরবরাহ অব্যাহত থাকে। তাই জন্মের পর ১৬ দিন পর্যন্ত পায়রা ও ঘুঘুর প্রধান ও একমাত্র খাদ্য মা ও বাবার ক্রপ নিসৃত ঐ পদার্থ। পিজিয়ান মিল্কের মধ্যে ২৫-৩০% ফ্যাট, ১০-১৫% প্রোটিন ও ৫% লেসিথিন পাওয়া যায়। এ ছাড়া ঐ দুধের কিছু ভিটামিনও থাকে কিন্তু কোনো শর্করা পাওয়া যায় না।

আজ পর্যন্ত কোনো স্তন্যপায়ী প্রাণীর দুধেও এত বেশী পরিমাণে ফ্যাট ও প্রোটিন পাওয়া যায় নি। কী কারণে শুধুমাত্র পায়রা ও ঘুঘুর মধ্যে এত বৈচিত্র্যময় ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অভিযোজন হলো তা আজও মানুষের বুদ্ধির বাইরে।

২। কুঞ্জ বিহারী

অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের বাওয়ার পাখি পূর্বরাগের জন্য (Courtship display) যে আশ্চর্যজনক কুঞ্জ তৈরি করে তা মানুষের কল্পনা ও রুচিবোধকে হার মানায়। প্রজনন ঋতুর আরম্ভে পুরুষ বাওয়ার একটি নিভৃত ও সুন্দর কুঞ্জ তৈরির জন্য উপযুক্ত জায়গা খুঁজতে থাকে। স্থান সংগ্রহের পর সে তার লেজ দিয়ে নিপুণভাবে জায়গাটাকে ঝাঁট দেয়। এরপর প্রায় তিন ফুট দীর্ঘ এক গোছ কাঠি বা গাছের ডাল যোগাড় করে ঐ পরিষ্কার করা জায়গায় চঞ্চু

দিয়ে পুঁতে দেয়। প্রায় ছ-ইঞ্চি তফাতে আরও এক গোছা কাঠি একইভাবে পোঁতে। কাঠিগুলিকে এমনভাবে পোঁতা হয় যাতে সেগুলি ভেতরের দিকে অর্থাৎ পরিষ্কার করা জায়গার উপর নুইয়ে পড়ে সুড়ঙ্গপথের আকার ধারণ করে। একেই কুঞ্জ বলা হয়। পরে ঐ পুরুষ পাখি নানা রঙ-বেরঙের দ্রব্য যথা, ফুলের পাঁপড়ি, বেরী, ছোট ছোট পাথর, পাতা, শামুকের ভাঙ্গা খোলা, কীট-পতঙ্গের দেহাংশ সংগ্রহ করে কুঞ্জের মেঝেতে সুন্দর করে ছড়িয়ে দেয়। এর পর কুঞ্জটিকে রঙ করার জন্য সে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। নানা রঙের ছোট ছোট রসাল ফল যোগাড় করে বাওয়ার পাখি তখন ঐ ফলগুলির রস দিয়ে কুঞ্জটিকে রাঙিয়ে তোলে। এই কাজে বাওয়ার পাখি যে চাতুর্য ও কৌশল দেখায় তা আশ্চর্যজনক। প্রথমে ফলগুলিকে মুখে চেপে রস বের করে নেয় এবং কুঞ্জের গায়ে ঢেলে দেয়। তারপর চঞ্চুর মাঝখান দিয়ে ঐ রস কুঞ্জের সর্বত্র লাগিয়ে দেয়। কখনো কখনো এক গোছা পাতা দিয়েও এই কাজ করে। বৃষ্টিতে কুঞ্জের রঙ নষ্ট হয়ে গেলে পাখিটি আবার তা নতুন করে রঙ করে। এ ছাড়া ফুলের পাপড়ি শুকিয়ে গেলেও পুরুষ বাওয়ার নতুন ফুল এনে কুঞ্জের মেঝেতে ছড়িয়ে দেয়।

পুরুষটির পছন্দ মতো কুঞ্জটি তৈরি হবার পর সে ঐ জায়গায় নানা রকম কসরৎ দেখিয়ে মেয়ে পাখিকে আকর্ষণ করার চেষ্টা করে। কখন কখন মেয়ে পাখিটি কুঞ্জের কাছে আসামাত্র পুরুষ পাখিটি মাটিতে শুয়ে পড়ে ডানা নাড়তে নাড়তে গড়াতে থাকে যতক্ষণ না ঐ রমণী তাকে গ্রহণ করতে রাজি হয় বা প্রত্যাখ্যান করে অন্যত্র চলে যায়। আবার কখনও আগুয়ান তরুণীর দিকে একটি সুন্দর রঙ্গিন ফল ছুঁড়ে দিয়ে তার মন পাবার চেষ্টা করে। প্রেমিকার মনোযোগ আকর্ষণ করা বা তার মন পাওয়ার জন্য পুরুষ বাওয়ার যে সব কৌতুকজনক আচরণ করে তা যুবক বা অন্যান্য বয়সের মানুষের মধ্যেও নানাভাবে দেখা যায়। যাই হোক, কুঞ্জ তৈরি করার জন্য অনুপ্রেরণা ও ক্ষমতা বাওয়ার পাখির জীবনে কীভাবে রূপায়িত হলো তা আজও রহস্যের অন্তরালে।

৩। অভিনব অভিযোজন

(ক) মাংসলোভী পাখি

প্রায় দু-শ বছর আগে নিউজিল্যাণ্ডে ভেড়া পালন আরম্ভ হয়। কীয়া প্যারট নামে একটি ফলভূক প্রজাতির পাখি কয়েক বছরের মধ্যে ভেড়ার শরীরের

পরজীবী কীট-পতঙ্গ খাওয়া আরম্ভ করে। এর প্রায় ১০—১৬ বছর পর হঠাৎ একদিন কোনো একটি কীয়া প্যারটের কামড়ে ভেড়ার গায়ের রক্তাক্ত কিছু অংশ উঠে আসে এবং পাখিটি তা খেয়েও ফেলে। দেখা গেলো যে কয়েক বছরের মধ্যে কীয়া প্যারট দলবদ্ধভাবে ভেড়া আক্রমণ করে তাদের শরীর থেকে মাংস ছিঁড়ে খাচ্ছে। আজ নিউজিল্যাণ্ডের সমস্ত কীয়া প্যারট ফল খাওয়ার দিকে বিশেষ মনোযোগ না দিয়ে ভেড়ার রক্তাক্ত মাংস খাওয়াই বিশেষভাবে রপ্ত করেছে। ফলে ভেড়া পালন করা ওদেশে এক বিরাট বিপর্যয়ের মুখে এসে পড়েছে। ফলভুক পাখি কি প্রয়োজনে ভেড়ার মাংস খাচ্ছে তা এক বিরাট রহস্য।

(খ) রুধীর পিয়াসী

অন্যান্য প্রজাতির মধ্যে জিওসপিজা ডিফিসিলিস, পাখি গ্যালাপ্যাগস দ্বীপপুঞ্জের প্রাচীনতম অধিবাসী। Darwin's finch নামে যা বিশ্বে পরিচিত। বিভিন্ন গাছের বীজ এর প্রধান খাদ্য। কিন্তু দেখা গেলো যে এই পাখিটি তার তীক্ষ্ম চঞ্চু দিয়ে রেড-ফটেড বুবিস নামে আর একটি প্রজাতির পাখির লেজ ও ডানায় আক্রমণ করে ক্ষতের সৃষ্টি করছে। বুবিসের ক্ষতস্থান থেকে চুইয়ে পড়া রক্ত জিওসপিজা অতি দ্রুত দক্ষতার সঙ্গে জিভ দিয়ে চুষে নেয়। পৃথিবীতে আর কোনো পাখির মধ্যে এ ধরণের আচরণ দেখা যায় না। অনুমান করা হয়েছে যে কোনো কারণে জিওসপিজা ডিফিসিলিস বুবিসের দেহে আক্রান্ত ছোট ছোট কীট-পতঙ্গ খাবার জন্য আকৃষ্ট হয়। কীট-পতঙ্গ সংগ্রহকালে কোনো একদিন জিওসপিজার চঞ্চুর আঘাতে বুবিসয়ের দেহ কেটে গিয়ে রক্তপাত হয় এবং জিওসপিজা তা পান করে। যেহেতু ঐ দ্বীপপুঞ্জে জলের অত্যন্ত অভাব এবং সেই জন্য জিওসপিজা তার আবিষ্কৃত তরল খাদ্যের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। এবং কালক্রমে এই আচরণ সমস্ত প্রজাতির মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

৪। খাদ্য সংগ্রহে কাঁটার প্রয়োগ

ইকোয়েডোর থেকে প্রায় এক হাজার মাইল পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগরে বিষুব রেখার উপর বিখ্যাত গ্যালাপ্যাগস দ্বীপপুঞ্জের অবস্থান। প্রকৃতি বিজ্ঞানের নানা তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রকৃতির লীলাক্ষেত্র এই দ্বীপপুঞ্জে চার্লস ডারউইন

১৮৩৫ সালে পদার্পণ করেন। ওখানে ফিঞ্চ সাদৃশ্য বেশ কয়েকটি প্রজাতির পাখি দেখে তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে পড়েন। পরবর্তীকালে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তিনি সিদ্ধান্তে আসেন যে ঐ পাখি সম্পূর্ণ নতুন ধরনের এবং গ্যালাপ্যাগস দ্বীপপুঞ্জ ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও এদের পাওয়া যায় না। এই ঘটনা ক্রমবিবর্তন সম্বন্ধে তাঁর চিন্তাধারার আমূল পরিবর্তন আনে এবং যা "The Origin of Species" বইতে পরিণতি লাভ করে সমগ্র মানব সমাজকে বিস্ময়াভূত ও চমৎকৃত করে দেয়।

ঐ ফিঞ্চ গোষ্ঠীর একটি প্রজাতির পাখি কাঠঠোকরার মতো গাছের ডালে উঠানামা করে খাদ্য সংগ্রহ করে। কাজেই এদের কাঠঠোকরা ফিঞ্চ বলা হয়। এই পাখি গাছের বাকলের ভিতর লুকিয়ে থাকা কীট-পতঙ্গ বের করার জন্য যে বুদ্ধিদীপ্ত উপায় গ্রহণ করে তা মানুষ ছাড়া আর কোনো প্রাণীর মধ্যে দেখা যায় না।

খাদ্য সংগ্রহের জন্য কোনো একটা গাছ নির্বাচনের পর কাঠঠোকরা ফিঞ্চ তার সোজা ও শক্ত চঞ্চু দিয়ে গাছের কাণ্ডে গর্ত করে। পরে ক্যাকটাস গাছের কাঁটা যোগাড় করে তার এক দিকে চঞ্চু দিয়ে চেপে ধরে অন্য দিক গর্তের ভিতর ঢুকিয়ে বেশ জোরে জোরে নাড়াতে থাকে। ফলে গর্তের ভিতরের কীট-পতঙ্গ কিছুক্ষণের মধ্যেই মাটিতে পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে কাঠঠোকরা ফিঞ্চ কাঁটা ফেলে দিয়ে ঐ কীট-পতঙ্গ উদরস্থ করে। কখনো কখনো ক্যাকটাস কাঁটার বদলে ঐ পাখি দু-তিন ইঞ্চি দীর্ঘ কোনো গাছের ডাল ভেঙ্গে একই-ভাবে খাদ্য সংগ্রহ করে। যদি কখনো সংগ্রহ করা গাছের ডালটা লম্বায় কিছু বড় হয়ে যায় তখন কাঠঠোকরা ফিঞ্চ উপরে দাঁড়িয়ে মাথা নিচের দিক করে গর্তের ভিতর কাঁটাটা ঢুকিয়ে দেয়। আবার যোগাড় করা গাছের ডাল খুব নরম হলে তাকে ঠিক মতো ব্যবহার করার জন্য ডালটার মাঝে চেপে ধরে গর্তের ভিতরে ঢুকিয়ে কীট-পতঙ্গ বের করার চেষ্টা করে।

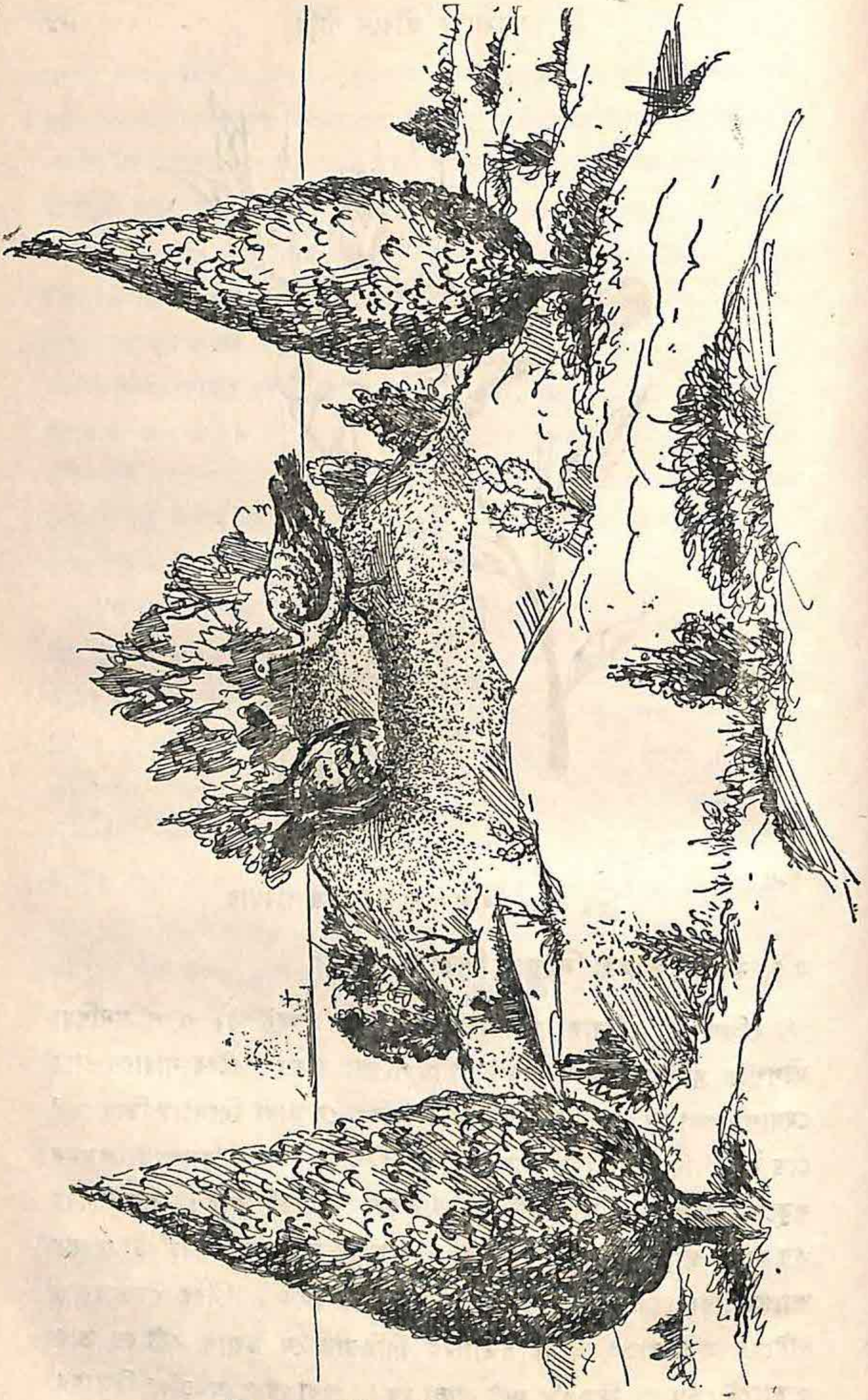
বেশির ভাগ সময় ঐ দ্বীপপুঞ্জ খুব শুষ্ক থাকে এবং তাই আত্মরক্ষার জন্য কীট-পতঙ্গ গাছের বাকলের ভিতরে আশ্রয় নেই। পতঙ্গভূক কাঠঠোকরা ফিঞ্চ প্রকৃত কাঠঠোকরার মতো গাছের ডালে নামাওঠা ও গর্ত করতে পারে। কিন্তু কীট-পতঙ্গ ধরার জন্য এই ফিঞ্চ পাখিদের কাঠঠোকরার মত নরম ও আঠালো জিভ নেই। কাজেই খাদ্য সংগ্রহের জন্য তার আচরণ এই ভাবে অভিযোজিত হয়েছে।



চিত্র নং ৮—খাদ্য সংগ্রহে কাঁটার ব্যবহার

৫। নীড়ের উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণে পিতা

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে অষ্ট্রেলিয়া ও পলিনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জে মুরগী সদৃশ এক ধরনের পাখি পাওয়া যায়। এদের সাধারণ ভাবে মেগাপড বলা হয়। মেগাপডের প্রধান বৈশিষ্ট্য যে তারা নিজেদের ডিমে 'তা' দেয় না। ডিম ফোটাবার ভার তারা প্রকৃতির হাতে ছেড়ে দিয়েছে। প্রজনন ঋতুতে মেগাপড পা দিয়ে মাটি আঁচড়ে একটা গর্ত তৈরি করে। অনেক সময় এর ব্যাস প্রায় ৩-৪ ফুট ও উচ্চতা ২-৩ ফুটের মতো হয়। ঢিবিটা দেখতে আগ্নেয়গিরির মতো এবং তার চূড়ায় একটা ছিদ্র থাকে। ঢিবির ভেতরের ও বাইরের লতা-পাতা, বালি ইত্যাদির বিক্রিয়ায় যে উত্তাপ সৃষ্টি হয় তার প্রভাবেই ভেতরের ডিমগুলি ফুটে বাচ্চা হয়। দেখা গেছে যে ঢিবির ভিতরের



উত্তাপ সাধারণত ২৯°—৩৫° সেঃ মধ্যে থাকে। এই উত্তাপের তারতম্য হলে পাখির ডিমগুলি নষ্ট হয়ে যায়। ঢিবির ভিতরের উষ্ণতা উপযুক্ত মাত্রায় আছে কিনা তা জানার জন্য মেগাপড যে উপায় গ্রহণ করে তা অত্যন্ত আশ্চর্যজনক। দেখা গেছে যে পুরুষ পাখি ঢিবিতে গর্ত করে মাঝে মাঝে মাথা ঢুকিয়ে ভেতরের তাপ পরীক্ষা করে। আবার কখনো কখনো ঢিবির ভেতরের দু-একটি পাতা মুখে তুলে উষ্ণতা পরীক্ষা করে। যদি ভেতরের উত্তাপ তার কম মনে হয় তবে তখনই সে নতুন লতাপাতা, চূনামাটি বা বালি এনে ঢিবির উপরে ছড়িয়ে দেয়। কখনও বা আবার ঢিবির চূড়ায় গর্ত করে সূর্যের আলো প্রবেশ করার ব্যবস্থা করে। কিন্তু ঠাণ্ডা পড়লে বা বৃষ্টি হলে ঐ গর্ত বন্ধ করে দেয়। মেগাপড কীভাবে এবং দেহের কোন অংশের সাহায্যে ঢিবির ভিতরের তাপমাত্রা বুঝতে পারে এ রহস্য আজও অজ্ঞাত। তার মাথায় ও চঞ্চুতে এমন কি আছে যা তাপমান যন্ত্রের কাজ করে?

৬। অনন্ত শক্তির বিকাশ

দক্ষিণ আমেরিকার ফুলের মধু সংগ্রহকারী পাখিদের অন্যতম ক্ষুদ্রকায় হামিংবার্ড বা গুঞ্জনপক্ষি তার দৈনন্দিন কাজের জন্য যে পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন করে তা মানুষের সাধ্য ও কল্পনার বাইরে। এছাড়া হামিংবার্ড অতি দ্রুত পক্ষ সঞ্চালন করে। শূন্যে স্থির হয়ে একই জায়গায় বহুক্ষণ থাকতেও পারে। আবার হামিংবার্ড পৃথিবীর একমাত্র পাখি যে পেছন দিকেও উড়তে পারে। উষ্ণরক্ত বিশিষ্ট প্রাণীদের মধ্যে হামিংবার্ডই একমাত্র প্রাণী যে নিজের দেহের ওজনের প্রতি এককে সবচেয়ে বেশী পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন করে। প্রতিদিনের কাজের জন্য এর প্রয়োজন প্রায় ১৫৫,০০০ ক্যালোরি উত্তাপ। মানুষকে যদি ঐ পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন করতে হয় তবে তাকে প্রতিদিন ১৩০ কেজি মাংস অথবা ১৬৫ কেজি সেদ্ধ আলু অথবা ৬০ কেজি রুটি খেতে হবে। শূন্যে স্থির থেকে পক্ষ সঞ্চালনের সময় হামিংবার্ড যে শক্তি উৎপন্ন করে তা মানুষের ক্ষমতার প্রায় দশগুণ।

লক্ষ লক্ষ বছর ধরে মানুষের দৃষ্টির বাইরে থেকে ফুলের মধু সংগ্রহের জন্য হামিংবার্ড বনে বনে ঘুরে বেড়িয়েছে—প্রকৃতি নির্বাচনের ফলেই তার এই অভিযোজন সম্ভব হয়েছে বলে মনে হয়।

৭। দাম্পত্য প্রেমের উজ্জ্বল স্বাক্ষর

শুধু গ্রামাঞ্চলেই নয় শহরের মানুষের কাছেও ধনেশ পাখি আজ বেশ পরিচিত। শীত আসার প্রারম্ভেই বেদের দল দু-একটি জীবিত বা মরা ধনেশ পাখি, বেশ কিছু হাড়গোড়, তেল ভর্তি নানা আকারের শিশি নিয়ে শহরের রাস্তায় ছড়িয়ে বসে। তারা দাবি করে যে ঐসব হাড়গোড় ও তেল ধনেশ পাখির এবং এদের ব্যবহারে মানুষের নানা রোগ ব্যাধি ও জরা দূর হয়ে যায়। বেদেদের কথার ঝলকে বহু শহুরে মানুষও ঐ ফাঁদে পা দেয়। আসলে ওসব বাজে কথা। কিন্তু ধনেশের বৈশিষ্ট্য অন্যত্র। প্রজনন ঋতুতে পুরুষ ধনেশ যে নিষ্ঠার সঙ্গে দাম্পত্য কর্তব্য পালন করে তা তুলনাহীন।

ডিম পাড়ার সময় উপস্থিত হলে মেয়ে ধনেশ পাখি এক বড় গাছের প্রাকৃতিক গর্তের মধ্যে আশ্রয় নেয়। পরে তার পরিত্যক্ত বিষ্টা ও পুরুষ ধনেশের সংগ্রহ করা কাদা-মাটি দিয়ে গাছের ঐ গর্তের মুখটা বন্ধ করতে আরম্ভ করে। মেয়ে পাখিটা তার বিরাট চঞ্চুকে কর্ণিকের মতো ব্যবহার করে আস্তে আস্তে ঐ গর্তের চারপাশে এমনভাবে লেপে দেয় যে শেষে গর্তের মুখটা বন্ধ হয়ে যায়, শুধু মাত্র একটা ছোট ফুটো অবশিষ্ট থাকে। এই কাজ সমাধা করতে তার তিন-চার দিন সময় লাগে। গাছের গর্তের ভিতরে বন্দী হয়ে মেয়ে ধনেশকে থাকতে হয় প্রায় তিন মাস অর্থাৎ বাচ্চাদের বয়স ১৫—১৬ দিন হওয়া পর্যন্ত। এই দীর্ঘ তিনমাস পুরুষ ধনেশ তার বন্দী স্ত্রীকে খাওয়ায়। সে তার স্ত্রীর জন্য নানারকম ফলমূল ও মাঝে মাঝে দু-একটি গিরগিটি যোগাড় করে গাছের কাণ্ডে দাঁড়িয়ে ঐ ছিদ্রের মধ্য দিয়ে খাবারগুলি স্ত্রীর মুখে গুঁজে দেয়। সাধারণত প্রতি ঘণ্টায় ৮—১০ বার সে খাবার নিয়ে আসে। রোদ, ঝড় যাইহোক না কেন পুরুষের এ-কাজের বিরাম নেই। তিন মাস সুখে জীবনযাপন করে সন্তানদের নিয়ে স্ত্রী-ধনেশ যখন ঐ গর্ত ভেঙ্গে বেরিয়ে আসে তখন তাদের দুজনের চেহারায় আমূল তফাৎ দেখা যায়। দীর্ঘদিন ধরে বিনা পরিশ্রমে খাওয়া-দাওয়ার ফলে মেয়ে ধনেশের দেহে প্রচুর চর্বি জমে ও তার ওজনও বেশ বেড়ে যায়। আর কঠিন পরিশ্রমের ফলে স্বামী বেচারির দেহ কঙ্কালসারে পরিণত হয়। সন্তান পালনে রত অসহায় স্ত্রীর জন্য এমন কর্তব্যপরায়ণ স্বামীর অস্তিত্ব শুধু অন্য প্রাণী কেন মানুষের মধ্যেও দুর্লভ।



চিত্র নং—১৭ দাম্পত্য প্রেমের উজ্জ্বল সাক্ষর

৮। প্রতিধ্বনি ও পথের নিশানা

পেরু ও ভেনজুয়েলার গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন গুহার মধ্যে বসবাসকারী অয়েলবার্ড বহু দিন ধরেই মানুষের কল্পনাকে বিহ্বল করেছে। তাই মানুষ এই পাখিকে পৃথিবীর প্রাণী মনে না করে তাকে নারকীয় জীব বলে বিশ্বাস করতো। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার গুহার মধ্যে সারা জীবন বসবাস করার ফলে অয়েল বার্ডের দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে যায়। কিন্তু তবুও দেখা যায় যে অয়েলবার্ড বিপুল বিক্রমে নানা রকম শব্দ উচ্চারণ করতে করতে গুহার সর্বত্র দাপটে ঘুরে বেড়ায়। দৃষ্টি শক্তি না থাকা সত্ত্বেও কিভাবে তারা সূচীভেদ্য অন্ধকার গুহায় সহজ ও সাবলীল ভাবে পথ খুঁজে পায় তা বহুদিন পর্যন্ত মানুষের অজানা ছিল। দেখা যায় যে অয়েলবার্ড গুহার মধ্যে ওড়ার সময় অনর্গল নানা রকম শব্দ উচ্চারণ করে। এই ডাকগুলির স্থায়িত্ব অল্প কিন্তু বেশ তীক্ষ্ণ। পরীক্ষা

করে দেখা গেছে যে অয়েলবার্ড উচ্চারিত শব্দ তরঙ্গের কম্পাঙ্ক ৬০০০—১০০০০ হার্টস। আরও জানা গেছে যে অয়েলবার্ডের কান যদি বন্ধ করে দেওয়া হয় তবে তারা ওড়ার সময় দিগনির্ণয় করতে পারে না। ফলে গুহার দেওয়ালে বারে বারে ধাক্কা খায় এবং তখন আরো উচ্চস্বরে ডাকতে থাকে। প্রমাণিত হয়েছে যে অয়েলবার্ড ওড়ার সময় যে শব্দ উচ্চারণ করে তা গুহার দেওয়ালে প্রতিফলিত হয়ে প্রতিধ্বনির সৃষ্টি করে এবং তারই সাহায্যে ওরা দিগনির্ণয় করে। কাজেই অয়েলবার্ড শ্রুতিগোচর শব্দের প্রতিধ্বনির সাহায্যেই গুহার মধ্যে চলাচল করে।

ইন্দোনেশিয়ার বিভিন্ন গুহায় সুইফটলেট নামে এক ধরনের পাখি বাস করে। অনুমান করা হয় যে তারাও অয়েলবার্ডের পথই অনুসরণ করে চলাচল করে।

জীবজগতের আর একটি প্রাণী চামচিকে বা বাদুড় শব্দের প্রতিধ্বনির সাহায্যে পথের নিশানা পায়। কিন্তু এরা শব্দোত্তর তরঙ্গের প্রতিধ্বনির উপর নির্ভর করে।

৯। দেখে ছিলেম চোখের বাহিরে

আলো-আঁধার ও প্রকৃতির নানা বর্ণময় রূপ ও সৌন্দর্য অনুভব করার জন্য চোখের প্রয়োজন এত প্রকট যে এ ব্যাপারে অন্য কিছুর অস্তিত্ব আমরা কল্পনা করতে পারি না। কিন্তু অনেক প্রাণী চোখের সাহায্য ছাড়াও শরীরের অন্যত্র অবস্থিত আলো সংবেদনশীল অংশের সাহায্যে 'দেখার কাজ' সম্পন্ন করে। যেমন কয়েকটি প্রজাতির পাখি মস্তিষ্কের সাহায্যে আলো-আধারের পার্থক্যটা বেশ ভাল ভাবেই বুঝতে পারে। যেমন চড়াই পাখির অপটিক নার্ভ অকেজো করে দিলে তারা দৃষ্টি শক্তি হারায়। কিন্তু মাথার উপরের পালক সরিয়ে দিলে চড়াই পাখি আবার দৃষ্টি শক্তি ফিরে পায়। এর থেকে অনুমান করা হয়েছে যে চড়াই পাখির মস্তিষ্কে আলো সংবেদনশীল কেন্দ্র আছে এবং যার সাহায্যে সে তার চোখ বন্ধ থাকলে বা অকেজো হলেও দৃষ্টি শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে।

১০। শক্তি সঞ্চয়ের উৎকৃষ্ট উপায়

খাদ্য সংগ্রহের জন্য যেসব প্রজাতির পাখি বহুদূরে উড়ে যায় এবং পরিযায়ী পাখির দুরান্তে উড়ার জন্য প্রচুর শক্তি ক্ষয় হয়। অল্প সময়ের মধ্যে তারা

যাতে নিঃশেষিত হয়ে না পড়ে সেজন্য দূরগামী পাখির দল নির্দিষ্ট কয়েকটি আকার (formation) গ্রহণ করে সংঘবদ্ধ ভাবে উড়ে চলার রীতি গ্রহণ করেছে। এইভাবে ওড়ার সময় দলভুক্ত প্রতিটি পাখি একটি নির্দিষ্ট স্থান গ্রহণ করে এবং একজন আর একজনের থেকে একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রাখে। যেমন খাদ্য সংগ্রহে যাবার সময় পানকৌড়ি পাখির দল একটা রেখার আকার ধারণ করে একজন আর-একজনের পেছনে ওড়ে চলে (line astern)। হাঁস, পেলিক্যান, সারস প্রভৃতি পাখি ইংরেজি উল্টো 'ভি' অক্ষরের আকার ধারণ করে ওড়ে—অর্থাৎ ভির ছুঁচালো অংশ সামনের দিকে থাকে। ফলে অগ্রভাবে অবস্থিত পাখির ডানার সঞ্চালনে ঐ স্থানে হাওয়ার আবর্তন সৃষ্টি হয় এবং হাওয়া উপরে উঠতে থাকে। পরবর্তী পাখিটি যদি ঠিক দূরত্ব বজায় রাখে তবে সে উর্ধ্বে উড্ডিন ঐ হাওয়ার সাহায্যে সহজেই উড়ে যেতে পারে। এই ভাবে এক-একটি দলের সব পাখি উর্ধে উড্ডিয়মান হাওয়ার সাহায্য গ্রহণ করে। এরই ফলে দেখা যায় যে উড়ন্ত পাখির ঝাঁক মাঝে মাঝে ডানা সঞ্চালন বন্ধ করে উর্ধে উড্ডিয়মান হাওয়ার সাহায্যে আকাশের বুকে উড়ে চলে। তাছাড়া প্রতিটি পাখি নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রাখতে পারে বলে ওঠার সময় কোনো সংঘর্ষ হয় না। নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য যে পাখিটি প্রথমে অগ্রভাগে থাকে বিশ্রাম নেবার জন্য কিছু সময় পরে দলের শেষে চলে আসে। কিছু সময় অন্তর এক-একটি পাখি 'ভি'-এর এক বাহু থেকে অন্য বাহুতে চলে এসে ঐ ধারের উর্ধে উড্ডিন হাওয়ার সাহায্য নেয়। আবার অনেক প্রজাতির পাখি 'ভি' আকার ধারণ করে দূরান্তে চলাচল করে।

১১। অভিনব স্বরযন্ত্র

নিজেদের মধ্যে যোগাযোগের জন্য পাখির কণ্ঠঃনিসৃত শব্দ সমষ্টি ও তার ব্যবহার অন্যান্য প্রাণী থেকে পাখির মধ্যে বিশেষভাবে সংগঠিত হয়েছে। পাখির উচ্চারিত নানা শব্দ-সমষ্টি তাদের জীবনের বহুরকম কর্মকাণ্ডের ভাবে বিন্যাস করে থাকে। কণ্ঠস্বর সৃষ্টির জন্য পাখির কণ্ঠনালীতে একটি বিশেষ ধরনের যন্ত্র তৈরি হয়েছে যা স্তন্যপায়ী প্রাণী থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এবং সেটি সিরিংক্স (syrinx) নামে পরিচিত। বক্ষ গহ্বরের যেখানে দুটি ব্রঙ্কাস মিলিত হয়ে ট্রাকিয়া তৈরি করে ঠিক সেই স্থানেই সিরিংক্সয়ের অবস্থান। সিরিংক্স তিন ভাবে তৈরি হতে পারে—যেমন ব্রঙ্কাস ও ট্রাকিয়া রূপান্তরিত হয়ে অথবা

ঐ দু'টি অংশ মিলিত ভাবে সিরিংক্স তৈরিতে অংশ গ্রহণ করে। স্বর সৃষ্টির কার্যকরী অংশ হিসাবে দুটি পর্দা পাওয়া যায়। একটি ট্রাকিয়ার তলদেশে প্রসারিত, অন্যটি প্রতিটি ব্রঙ্কাসের মধ্যে বিস্তৃত। এদের যথাক্রমে এক্সটারনাল ও ইনটারনাল টিমপ্যানিক পর্দা বলা হয়। এছাড়া স্বর-সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় পেশী, এক্সটারনাল লেবিয়া প্রভৃতি কতকগুলি অংশও পাওয়া যায়। প্রতিটি ব্রঙ্কাসে আলাদাভাবে ঐ সব বস্তু থাকার জন্য সিরিংক্সও একই সময়ে দু'ভাবে কাজ করতে পারে।

পাখি যখন শব্দ উচ্চারণ করতে উদ্যত হয় তখন ফুসফুস ও সিরিংক্সের মাঝের কপাটিকা বন্ধ হয়ে যায়। তারপর বক্ষপেশীর সঙ্কোচনের ফলে বায়ু থলিতে চাপ সৃষ্টি হয়। সিরিংক্সের চারদিক ঘিরে যে ইণ্টারক্লাভিকিউলার বায়ুথলি আছে তার চাপে টিমপ্যানিক পর্দা ব্রঙ্কাসের মধ্যে প্রবেশ করে বায়ু চলাচলের রাস্তা ক্ষণিকের জন্য বন্ধ করে দেয়। এরপর সিরিনজিয়াল পেশীর উপর চাপ পড়ে। ফলে রুদ্ধ ব্রঙ্কাসের পথ পরিস্কার হয়। এবং দ্রুততার সঙ্গে বায়ু প্রবাহের ফলে উত্তেজিত টিমপ্যানিক পর্দা আন্দোলিত হয়ে স্বর সৃষ্টি করে। যেহেতু দুটি ব্রঙ্কাসে স্বর-সৃষ্টিকারী এক প্রস্থ যন্ত্র আছে সেজন্য পাখি একই সময়ে দুটি ব্রঙ্কাসে আলাদাভাবে শব্দ সৃষ্টি করে দ্বৈত স্বর নিঃসৃত করতে পারে।

১২। বায়ুথলি

পাখির শরীরের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে শ্বাস-তন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত উষ্মবায়ুপূর্ণ ন'টি থলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ব্রঙ্কাস থেকে বেরিয়ে এই বায়ুথলিগুলি দেহাভ্যন্তরে ছড়িয়ে পড়েছে এবং ছোট ছোট নালীকার দ্বারা শরীরের বিভিন্ন অংশে অবস্থিত ফাঁপা হাড়ের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। তাছাড়া এই থলিগুলি ফুসফুসের সঙ্গেও যুক্ত।

গলদেশে মেরুদণ্ডের দু'পাশ দিয়ে প্রসারিত সারভাইক্যাল বায়ুথলির অবস্থান। এরা প্রথমে ভেণ্ট্রব্রঙ্কাসের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। ট্রাকিয়া, গলবিল ও হৃদপিণ্ডের সামনে যে বায়ুথলিটি আছে তা ইনটারক্লাভিকিউলার নামে পরিচিত। এটিও প্রথম ভেণ্ট্রব্রঙ্কাসের সঙ্গে যুক্ত। ফুসফুস ও ষ্টারনামের মধ্যে প্রসারিত বায়ুথলি দুটিকে বলা হয় অ্যানটিরিয়র থোরাসিক। এরা তৃতীয় অথবা চতুর্থ ভেণ্ট্রব্রঙ্কাসের সঙ্গে যুক্ত। এর পরের থলি দুটি পসটিরিয়র

থোরাসিক এবং পরবর্তীটির নাম অ্যাবডোমিনাল বায়ুথলি যা দেহাভ্যন্তরে প্রসারিত হয়েছে।

পাখির শরীরে বায়ুথলির অবস্থান ১৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়ম হার্ভের দ্বারা আবিষ্কারের পর থেকে আজ পর্যন্ত এদের প্রকৃত কাজ নিয়ে বহু মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে। (১) যেমন, শ্বাস গ্রহণের সময় বায়ু ফুসফুসের মধ্য দিয়ে বায়ুথলিতে প্রবেশ করে এবং শ্বাস ত্যাগের সময় দূষিত বায়ু আবার ঐ পথ দিয়েই বেরিয়ে যায়। ফলে পাখির ফুসফুসে দূষিত বায়ু কখনও আবদ্ধ থাকে না কাজেই পাখির শ্বাসতন্ত্রের মধ্যে বিশুদ্ধ বায়ুর প্রবাহ সবসময় অব্যাহত থাকে। (২) বায়ুথলির জন্য পাখির ওজন অনেক কমে যায়। (৩) বায়ুথলিগুলি পাখির শ্বাস-প্রশ্বাসের কার্যকারিতা অনেক বাড়িয়ে দেয়। (৪) দ্রুত বিপাকীয় কাজের জন্য পাখির শরীরের উষ্ণতা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বায়ুথলিগুলি শরীরকে ঠাণ্ডা করার কাজে নিযুক্ত হয়। দেখা গেছে যে, পাখি যত বায়ু গ্রহণ করে তার $\frac{১}{৪}$ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য ও $\frac{৩}{৪}$ অংশ দেহ ঠাণ্ডা রাখার জন্য ব্যবহার হয়। (৫) বায়ুথলির উপস্থিতির জন্য পাখি অতি সহজে ১৬০০০—১৮০০০ ফুট উর্ধ্বে উড়তে পারে। কিন্তু ৯০০০ ফুট উর্ধ্বে উঠলেই স্তন্যপায়ী প্রাণী শ্বাস কষ্ট অনুভব করে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে ইণ্টারক্লাভিকিউলার বায়ুথলি পাখির কণ্ঠস্বর সৃষ্টির জন্যও অপরিহার্য।

বিলুপ্তির সীমানায় দাঁড়িয়ে

গত শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে আজ পর্যন্ত অন্যান্য প্রাণী সমেত বহু পাখি ভারতের মাটি থেকে বিদায় নিয়েছে। আরও অনেক পাখি প্রকৃতির নিয়মে ও মানুষের অপরিণামদর্শী কাজের ফলে বিলুপ্তির সীমানায় এসে দাঁড়িয়েছে। এখানে তারই কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হলো—

(ক) যারা চলে গেলো ঃ

মাউনটেন কোয়েল ঃ ছ-থেকে সাত হাজার ফুট উর্ধ্বে মুসৌরি ও নৈনিতালের নিকটবর্তী স্থানে এদের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র ছিল। ১৮৭৬ সালের পর মাউনটেন কোয়েলকে আর পাওয়া যায় নি।

পিঙ্ক-হেডেড ডাক বা শাকনাল ঃ হিমলালয়ের তরাই ও ডুয়ার্স অঞ্চলে,

মণিপুর ও বিক্ষিপ্তভাবে আরও কয়েকটি স্থানে এই পাখি নিশ্চিন্তে বিরাজ করতো। ১৯৩৫ সালের পর এদের আর দেখা যায় নি।

জারডন কোরসার: গোদাবরী উপত্যকার নেলোর, অনন্তপুর ও তার নিকটবর্তী কয়েকটি স্থানে এক সময় জরডন কোরসার বিচরণ করতো। ১৯০০ সালের পর থেকে বহু চেষ্টা করেও ভারতের কোনো অঞ্চলে আর পাওয়া যায় নি।

(খ) যারা বিলুপ্তির পথে:

১। গ্রেট ইণ্ডিয়ান বাসটার্ড (তুকদার)
২। মোনাল ফেজাণ্ট
৩। চীর ফেজাণ্ট
৪। ক্রিমসন ট্রাগোপ্যান
৫। ওয়েষ্টার্ন ট্রাগোপ্যান
৬। ব্লিথ ট্রাগোপ্যান
৭। বেঙ্গল ফ্লোরিক্যান (লীখ)
৮। লার্জ পায়েড হর্নবীল (রাজধনেশ)
৯। হোয়াইট-উব্‌গড্‌ উভডাক (দেহান)

গ্রেট ইণ্ডিয়ান বাসটার্ড বা তুকদার

প্রায় তিন ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট ও পনেরো কেজি ওজনের সাদা-কালোয় রং মাখানো ঝুঁটিধারী বাসটার্ড পাখি ভারতের মাটি থেকে চলে যাবার পথে এসে দাঁড়িয়েছে। শতাব্দীকাল আগেও ভারতের বিস্তীর্ণ স্থান জুড়ে যেমন— মহারাষ্ট্র, গুজরাট, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ; বিক্ষিপ্তভাবে পাঞ্জাব, সিন্ধুপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক ও মাঝে মাঝে উত্তরপ্রদেশ ও ওড়িশার শুষ্ক ও অর্ধশুষ্ক স্থানে বিচরণ করতো। ১৯৩২ সালে সিন্ধুপ্রদেশের স্থকার অঞ্চলে সিন্ধুনদীর বাঁধ তৈরি হবার পর সেখানে মানুষের সংখ্যাধিক্য ঘটে। মানুষের কোলাহলে বিভ্রান্ত হয়ে বাসটার্ড ঘর ছেড়ে দূরান্তে চলে গেল। পরবর্তীকালে ভারতের বিভিন্ন স্থানে জনস্ফীতির সঙ্গে সঙ্গে কৃষিক্ষেত্রের ব্যাপ্তি ঘটে। ফলে ঐসব স্থানে বাসটার্ডের বাসভূমিতেও কৃষিক্ষেত্র প্রসারিত হয়ে ঐ পাখিকে স্থানচ্যুত করতে আরম্ভ করে।

কোনো খাদ্যেই বাসটার্ডের অরুচি নেই, তাই কীট-পতঙ্গ, সরীসৃপ, স্তন্যপায়ী প্রাণী যেমন এদের প্রিয় তেমনি মরুপ্রায় রাজস্থানের নানা উদ্ভিদের বীজ, ফল ও অন্যান্য অংশও তেমন প্রিয়। কিন্তু বর্তমানে তাদের খাদ্যসংগ্রহের স্থান সঙ্কুচিত হয়ে পড়ায় বাসটার্ডকে খাদ্যের সন্ধানে ৮—১০ মাইল দূরেও চলে যেতে হয়। সাধারণত দু-তিনটি পাখি একসঙ্গে থাকে, কিন্তু মাঝে মাঝে ২৫—৩০টি বাসটার্ডকে একত্রে দেখা যায়। এরা খুব দ্রুতগামী এবং ওড়ার ক্ষমতাও প্রচুর।

বর্ষার আগমনে বাসটার্ড প্রেমলীলা আরম্ভ করে নীড় বাঁধার প্রেরণা পায়। মাটিতে সামান্য গর্ত খুঁড়ে অতি সাধারণ একটা নীড় তৈরি করে থাকে। পুরুষ পাখি বহুপত্নীর অধিকারী এবং হারেম রক্ষার জন্য অত্যন্ত সচেষ্ট। প্রতি নীড়ে জলপাই রংয়ের একটিমাত্র ডিম দেখা যায়। ডিম থেকে নবজাতকের আবির্ভাব হতে প্রায় ৪০ দিন সময় লাগে।

বাসটার্ডের বাসভূমিতে মানুষ ও গৃহপালিত প্রাণী অবাধে প্রবেশ করছে। তাই উন্মুক্ত নীড়ে অরক্ষিত ডিমগুলি মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর চলাচলে পদদলিত হয়ে নষ্ট হচ্ছে। লোভী মানুষ বাসটার্ডের মাংসের লোভে তাদের নির্বিচারে হত্যায় উদ্যত হতো। এইভাবে চতুর্দিক থেকে মানুষের আক্রমণে বিগত ৪০ বছরের মধ্যে এরা নিজ বাসস্থান পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে এবং সংখ্যায়ও কমেছে। তাই আজ রাজস্থানের জয়সলমীর জেলার কয়েকটি স্থানে বাসটার্ড আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। হয়তো অফুরন্ত প্রাণশক্তি ও অভিযোজন ক্ষমতার জন্য এত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও মানুষের জিঘাংসা উপেক্ষা করে বেঁচে থাকার চেষ্টা করতে পারছে। কিন্তু সে আর কতদিনের জন্য!

চীর ফেজাণ্ট

হিমালয় পর্বতমালার উত্তর ও পশ্চিম সীমান্তের অনেকটা স্থান জুড়ে ৪০০০ ফুট উর্ধ্বে হাজারা থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত ওক বনাঞ্চল চীর ফেজাণ্টের বাসভূমি। পাঁচ-ছয় জনের এক-একটি দল উন্মুক্ত পাহাড়ে খাদ্যের সন্ধানে সারাদিন ব্যস্ত থাকে। বিভিন্ন গাছের শিকড়, বীজ, শস্যদানা, কীট-পতঙ্গ সবই ফেজাণ্টের খাদ্য-তালিকায় স্থান পায়। স্বভাবে ভীতু এই পাখি সামান্যতম বিপদের সংকেত পেলে বিদ্যুৎগতিতে জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে পড়ে। এরা সাধারণত দিনের বেলায় নিঃশব্দে থাকে। কিন্তু নিশাবসানে ও রাত্রিবাসে

যাবার আগে বহুসময় ধরে এদের কলকাকলি বন থেকে বনান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। উদাত্ত কণ্ঠে এদের 'চীর-এ-পীর' ডাকে সমগ্র বনভূমি আন্দোলিত হয়ে পড়ে।

এপ্রিল থেকে মে মাস পর্যন্ত চীর ফেজাণ্ট নবপ্রাণ সৃষ্টির কাজে ব্যস্ত থাকে। কোন উন্মুক্ত চীর ও ওক বনভূমিতে ; রুক্ষ পাহাড়ের পাদদেশে ঘাস, লতাপাতা দিয়ে এরা সুন্দর নীড় তৈরি করে। ৯—১৪টি হালকা ধূসর রংয়ের ডিম নীড়ে দেখা যায়। প্রায় ২৬ দিন পরে নীড়ে নূতন প্রাণের সাড়া মেলে।

যুগযুগ ধরে এই নিরালা পাহাড়ের কোলে চীর ফেজাণ্ট নিশ্চিন্তে মনের আনন্দে নিজেদের নিয়ে মশগুল আছে। কিন্তু আজ মানুষের পদার্পণ ঘটেছে এদের নিভৃত আবাসভূমিতে—তাই চীর ফেজাণ্ট ভীত, সন্ত্রস্ত এবং আত্মরক্ষায় ব্যস্ত। কিন্তু মানুষের নিষ্ঠুরতার কাছে এরা হেরে যাচ্ছে। ফলে আর কিছুকালের মধ্যে চীর ফেজাণ্ট ভারতের মাটি থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হবে।

মোনাল ফেজাণ্ট

প্রায় ২ ফুট দীর্ঘ, বাদামী, সবুজ ও বেগুনি রঙয়ে রাঙানো ঝুঁটিধারী মোনাল ফেজাণ্টের জীবনও আজ বিপন্ন। পূর্বআফগানিস্থান থেকে শুরু করে উত্তর-পশ্চিম পাকিস্তান, কাশ্মীর, পাঞ্জাব,হিমাচল প্রদেশ, গাড়োয়াল ও নেপালে মোনাল ফেজাণ্টের পদধ্বনি শোনা যায়। ওক, রডোডেনড্রন ও দেওদারের ঘন বনে ছড়িয়ে থাকা ঘাস ও অন্যান্য লতাগুল্মে ঢাকা নিরালা স্থান এদের অত্যন্ত প্রিয়। একটি পুরুষ কয়েকটি মহিলা পরিবৃত হয়ে অথবা কখনো কখনো কয়েকটি পুরুষ বা মেয়ে ফেজাণ্ট একত্রিত হয়ে খাদ্যের সন্ধানে পার্বত্য পশুচারণ ভূমিতে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু প্রয়োজনে বরফাবৃত পার্বত্য-ভূমিতেও সহজ ও সাবলীল ভঙ্গিতে এরা বিচরণ করে। বিভিন্ন শস্যদানা, বীজ, শিকড়, কীট-পতঙ্গ এদের প্রিয় খাদ্য। প্রয়োজনে বরফের আবরণ ভেদ করে খাদ্য খুঁজে নিতে মোনাল ফেজাণ্টের কোনো অসুবিধা হয় না।

এপ্রিল থেকে জুন মাস পর্যন্ত মোনাল ফেজাণ্ট প্রজননের কাজে ব্যস্ত থাকে। বহু পত্নীতে আসক্ত পুরুষ ফেজাণ্ট মাটিতে গর্ত খুড়ে নীড় রচনা করে। প্রতি নীড়ে ৪-৬ টি ডিম পাওয়া যায়।

বর্তমানে মানুষের অপরিণামদর্শী কাজের ফলে মোনাল ফেজাণ্টের অস্তিত্বও আজ বিপন্ন।

ক্রিমসন ট্রাগোপ্যান :

বর্ণ সম্ভারে উজ্জ্বল, দর্শনীয় এবং ঝুঁটিমাথা ট্রাগোপ্যানকে বহু দূর থেকে সনাক্ত করা যায়। উত্তর ও উত্তর-পূর্ব পার্বত্য অঞ্চলের এক বিস্তীর্ণ স্থান যেমন, নেপাল, গাড়োয়াল, সিকিম, ভূটান ও তার সংলগ্ন এলাকায় ট্রাগোপ্যান বিচরণ করে। ৪০০০-৬০০০ ফুট উচ্চতায় খাড়া পাহাড়ে ওক, রডোডেনড্রন ও দেওদারের জঙ্গল এদের অত্যন্ত প্রিয়।

বিভিন্ন গাছের পাতা বিশেষ করে ডাইপ্লাজিয়ম ও পলিপোডিয়াম ফার্ণের পাতা ট্রাগোপ্যানের প্রিয় খাদ্য।

মধ্য গ্রীষ্মে বরফ গলার পর এরা নতুন প্রাণ সৃষ্টির জন্য প্রেরণা অনুভব করে এবং মে-জুন মাসের মধ্যে নীড় বাঁধার কাজ শেষ করে। গাছের ডালে শুকনো কাঠি দিয়ে অতি সাধারণ একটা নীড় তৈরি করতে এরা সক্ষম হয়। পূর্বরাগ শেষ হওয়ার পর মেয়ে ট্রাগোপ্যান ২-৪ টি রক্তাভ ডিম উপহার দেয়। কুড়ি থেকে পঁচিশ দিনের মধ্যে নীড়ে নূতন প্রাণের আবির্ভাব হয়।

নির্বিচারে বনভূমি সংহারে লিপ্ত মানুষ নিতান্ত স্বার্থপরের মত বনবাসীদের জন্য বিন্দুমাত্র সহানুভূতি দেখায় না। তাই অন্যান্য প্রাণী সমেত ট্রাগোপ্যানের জীবন হরণ করা হচ্ছে। এক কালের ওক ও দেওদারে ঘেরা মোহময় নিভৃত বাসভূমি বর্তমানে রুক্ষ ও বৃক্ষহীন শিলাস্তূপের উপর দাঁড়িয়ে ট্রাগোপ্যানের আজ এক মাত্র ভাবনা—মৃত্যু আর কত দূরে ?

পরিশিষ্ট—১

কয়েকটি পাকা ফলের প্রধান উপাদান (প্রতি একশ গ্রামে)

ফল	প্রো	ফ্যাট	কার্ব.	ক্যাল.	আয়.	ফস	ভিটামিন (আই ইউ)				
				গ্রাম	মিগ্রা	গ্রা	এ	বি১	বি২	নিয়াসিন	সি
আপেল	০'৩	০'২	১৩'৪	০'০১	১'৭	০'০২	অ	১২০	৩০	০'২	২
কলা	১'৩	০'২	৩৬'৪	০'০১	০'৪	০.০৫	অ	১৫০	৩০	০'৩	১
পেয়ারা	১'৫	০'২	১৪'৫	০'০১	১'০	০'০৪	অ	—	৩০	০'২	২৯৯
পেঁপে	০'৫	০'১	৯'৫	০'০১	০'৪	০'০১	২০২০	—	২৫	০'২	৪৬
কমলালেবু	০'৯	০'৩	১০'৬	০'০৫	০'১	০'০২	৩৫০	১২০	৬০	—	৬৮
টমাটো	১'০	০'১	৩'৯	০'০১	০'১	০'০২	৩২০	১২০	৬০	০'৪	৩২

পরিশিষ্ট—২

গাঙ্গেয় সমভূমিতে শালিক পাখির (৬৩২) খাদ্য-তালিকা

খাদ্য	ওজন (গ্রাম)	কতবার পাওয়া গেছে
অর্থপটেরা	৬০২'৭৫	৫১০
ডিপটেরা	৭০'২৮	১১০
কোলিওপটেরা	৮২৫'৭০	৬০৫
লেপিওপটেরা	৭০২'০০	৫৭০
ওডনেটা	১৯০'০০	১৩৫
ডারমাপটেরা	১৮০'২০	২১৫
হোমপটেরা	১৫০'৭০	১২০
হেমিপটেরা	৭৩০'৭৫	৫৯০
হাইমেনপটেরা	১১০'৭০	১১০
আইসপটেরা	১০৫'৭৫	১২০
ডিক্টিওপটেরা	৯০'০০	১১৫
সাইফানকিউলেটা	৭০'৩৬	১২০
অ্যানিলিডা	২০০'০০	২২৫

খাদ্য	ওজন (গ্রাম)	কতবার পাওয়া গেছে
অন্যান্য প্রাণী দেহের অবশিষ্টাংশ	৬৯'১০	১২৪
নিমফল	১২০'৩০	৮৫
ডুমুর	৭৫'১৫	১১২
বটফল	১১৮'০০	১২০
অশ্বথ ফল	৮৪'৯০	১৩০
ছোলা	৪৫'৭০	১২০
ফুলের পাঁপড়ি	সামান্য	৪৬
অন্যান্য উদ্ভিদের অংশ বিশেষ	সামান্য	৩০

পরিশিষ্ট—৩

গাঙ্গেয় সমভূতিতে ঋতুভিত্তিক শালিক পাখির (৬৩২) খাদ্য তালিকা।

খাদ্য—	শীতকাল (২১৫)		প্রাকবর্ষা (৯২)		বর্ষা (২১০)		বর্ষার পর (১১৫)	
	সংখ্যা	ওজন (গ্রা)	সংখ্যা	ওজন (গ্রা)	সংখ্যা	ওজন (গ্রা)	সংখ্যা	ওজন (গ্রা)
কীট-পতঙ্গ	২১৫	২১০'৭৫	৯২	১৩২০'২০	২১০	১৭৬০'১০	১১৫	৫০৩'১
ডুমুর	১০	১৮'১০						
অশ্বথ ফল					১৩০	৮৪'৯০		
বট ফল			১৯	৩২'৭০	১১০	৮৬'১০		
নিম ফল			৮৫	১২০'১০				
ছোলা	১১০	৪৫'৭০						
কেঁচো			৪৫	৬০'৩০	১৮০	১২০'১০	৩০	১৯'৬০
অন্যান্য প্রাণীর অবশিষ্টাংশ	৭	০৬'৮	৪৫	২০'১০	৭০	৩০'৭৫	২০	১২'২০

পরিশিষ্ট—৪

চূঁচড়া (পঃ বঙ্গ) কৃষি খামারে বাবুই পাখির পাকস্থলিতে যে সব দ্রব্য পাওয়া গেছে তার তালিকা।

পাখি	সংখ্যা	পাকস্থলিতে যা পাওয়া গেছে—	ওজন (গ্রাম)		কত ক্ষেত্রে
বাবুই	১০০	ধান	২০০.৪০		১০০
		গম	৫০.০৮	—	৪
		বন্য শস্যের বীজ			৫
		শামুকের খোলা		—	৪
		কীট পতঙ্গের অংশ		—	১
		পাখির পালকের অংশ		—	৮০
		ইঁটের টুকরো		—	৪
		অন্যান্য দ্রব্যের অবশিষ্টাংশ :	৩০.০২		

পরিশিষ্ট—৫

পরীক্ষিত পাখির ডিমে কীটনাশক রাসায়নিক দ্রব্যের অবশিষ্টাংশ।

পাখি	সংখ্যা	ডি. ডি. ই	ডি. ডি. টি	ডাইএলড্রিন	পি. সি. বি
এনহিংগা	১০	১০	—	—	১০
সবুজ হেরন	২৭	২৭	১	৫	১২
বেগনি হেরন	৩৬	৩৬	১০	১০	২৪
ক্যাটেল ইগরেট	২৬	২৬	১০	১০	২৬
স্নোয়ি ইগরেট	৩০	৩০	৭	১০	১৮
গ্লসি আইবিস	২১	২১	১১	১০	১১

পরিশিষ্ট—৬

পরীক্ষিত পাখির বিভিন্ন টিস্যুতে কীটনাশক রাসায়নিক দ্রব্যের অবশিষ্টাংশ

পি পি এম

পাখি	টিস্যু—	ডি.ডি.ই	ডি.ডি.ডি	ডি.ডি.টি	ডাইএলড্রিন
ওয়েষ্টার্ন ক্রেন—	ব্রেষ্ট—	০'১০	০'০৪	—	০'০৩
	লিভার—	০'০৭	০'১১	—	০'০৩
	ব্রেন—	০'৫০	০'৫৯	০'০৬	
ইষ্টার্ন কাইট—	কারকাসেস—	০'২৮	০'০৬	০'০৯	০'০২
	লিভার—	০'৪৩	০'১২	০'২৬	০'০৯

পরিশিষ্ট—৭

সল্টলেক অঞ্চলের কয়েকটি বিশিষ্ট পরিযায়ী পাখি

১।	স্পটেড বিলড পেলিক্যান	: পেলিকেনাস ফিলিপেনিস
২।	স্পুনবিল	: প্লেটালিয়া লিউকরোডিয়া
৩।	রেড ব্রেস্টটেড মারগেনসার	: সারগাস সেরেটর
৪।	পোচার্ড	: আইথিয়া ফুলিগুলা
৫।	গডওয়াল	: অ্যানাস স্ট্রেপেরা
৬।	ম্যালার্ড	: অ্যানাস প্লাটিবিংকাস
৭।	ব্রাহ্মণি ডাক	: টেডরনা থোরুজিনিয়া
৮।	বারহেডেড গুজ	: অ্যানিসার ইণ্ডিকাস
৯।	গ্রেহেডেড ল্যাপউইঙ্গ	: ভ্যানেলাস সিনিবিয়াস
১০।	গ্রেপ্লোভার	: প্লুভিয়ালিস স্কোয়াটোরোলা
১১।	গ্রীন সাণ্ডপাইপার	: ট্রিনগা ওকরোয়াস
১২।	উড স্নাইপ	: গ্যালিনেগো নেমোরিয়োকা
১৩।	ব্রাউন হেডেড গাল	: ল্যারাস ক্রনিসেফালাস
১৪।	ব্লাক হেডেড গাল	: ল্যারাস রিডিবুনডাস
১৫।	ইউয়িসকার্ড টার্ন	: চিলিডোনিয়াস হাইব্রিডা
১৬।	পেরিগ্রিন ফকন	: ফ্যালকো পেরিগ্রিনাস
১৭।	পায়েড হরিয়ার	: সারকাস মেলানোলিউকস
১৮।	ক্রেসটেড সারপেন্ট ঈগল	: স্পাইলরনিস চিলা
১৯।	রেন কোয়েল	: কোটরনিক্স বারম্যানডিলিকা
২০।	রুফাস টারটল ডাভ	: স্ট্রেপটোপিলিয়া ওরিয়ণ্টালিস
২১।	পাইড ক্রেসটেড কুকু	: ক্লামেটর জ্যাকোবাইনাস
২২।	স্ট্রায়েটেড সোয়ালো	: হিরুনডো ডরিকা
২৩।	প্যারাডাইজ ফ্লাইক্যাচার	: টারপসিফেনি প্যারাডিসি
২৪।	ইউরেসিয়ান গ্রেট রেড ওয়ারবলার	: অ্যাক্রসেফালাস আরুনডিনাসিয়াস
২৫।	হোয়াইট স্পটেড ব্লু থ্রোট	: এরিথেক্যাস এ্যকোটি
২৬।	ইয়োলো ওয়াগটেল	: মোটাসিলা ফ্লেবা
২৭।	হোয়াইট ওয়াগটেল	: মেটোসিলা আলবা

২৮।	ইয়েলো ব্রেসটেড বাংটিন	: এমবারইজা অরিওলা
২৯।	রোজী প্যাসটর	: ষ্টারনাস রোজিয়াস

পরিশিষ্ট—৮

শহরে রূপান্তরিত হবার আগে সিঁথিতে যেসব পাখি নীড় বাঁধতো

১।	হাউস ক্রো	: কর্ভাস স্পেলনভেন
২।	ট্রি পাই	: ডেণ্ডোসিটা ভ্যাগাবাণ্ডা
৩।	গ্রে টিট	: প্যারাস মেজর
৪।	ইওলো চিকড্ টিট	: প্যারাস জ্যানথোজিনাস
৫।	জাঙ্গেল বাবলার	: টারডয়ডিস স্ট্রায়েটাস
৬।	কমন আইওরা	: অ্যাজিথিনা টিফিয়া
৭।	রেডভেনটেড বুলবুল	: পিকননোটাস কাফের
৮।	রেড হুয়িসকার্ড বুলবুল	: পিকননোটাস জোকোসাস
৯।	ম্যাগপাই রোবীন	: কপসাইকাস সলেরিস
১০।	বে-ব্যাকট্ শ্রারাইক	: লেনিয়াস ভিটেটাস
১১।	ব্লাক ড্রঙ্গো	: ডিক্রুরাস এডসিমাইলিস
১২।	টেলার বার্ড	: অর্থটোমাস স্থচরিয়াস
১৩।	হলদে ওরিয়ল	: অরিওলাস ওরিওলাস
১৪।	ব্লাক-হেডেড ওরিয়ল	: অরিওলাস জ্যানথরনাস
১৫।	গ্রে-হেডেড ময়না	: ষ্টুরনাস ম্যালারেরিকাস
১৬।	ব্লাক-হেডেড ময়না	: ষ্টুরনাস প্যাগোডেরাম
১৭।	শালিক	: অ্যাক্রিডোথেরিস ট্রিসটিস
১৮।	ব্যাংক ময়না	: অ্যাক্রিডোথেরিস জিনজিনিয়ানাস
১৯।	কমন উইভার বার্ড	: প্লোসিয়াস ফিলিপাইনাস
২০।	হাউস স্প্যারো	: প্যাসার ডোমিসটিকাস
২১।	পারপেল সানবার্ড	: নেকটারিনিয়া এশিয়াটিকা
২২।	পারপেল রামপড্ সানবার্ড	: নেকটারিনিয়া জাইলোনিকা
২৩।	মারাঠা উডপেকার	: ডেনড্রোকপাস মারাঠাএনসিস
২৪।	গোল্ডেন ব্যাকড্ উডপেকার	: ডিনোপিয়াম বেঙ্গালেনসিস

২৫। কপারস্মিথ	: মেগালামিয়া হেমাসেফালা
২৬। কোয়েল	: ইউডাইনেমাস স্কলোপেসিয়া
২৭। কোকিল	: সেনট্রোপাস সাইনেনসিস
২৮। লার্জ ইণ্ডিয়ান প্যারাকিট	: সিট্টাকিউলা ইউপ্যাটরিয়া
২৯। রোজ রিংগড্ প্যারাকিট	: সিট্টাকিউলা ক্রামেরী
৩০। ব্লু জে	: কোরাসিয়াস বেঙ্গালেনসিস
৩১। কমন গ্রীন বি-ইটার	: মেরপস ওরিয়ানটালিস
৩২। পাইড কিংফিসার	: সিরিল রুডিস
৩৩। কমন কিংফিসার	: আলসিডো আথিস
৩৪। বার্ন আউল	: টাইটো আলবা
৩৫। স্পটেড আউলেট	: অ্যাথিনি ব্রামা
৩৬। বেঙ্গল ভালচার	: জিপস বেঙ্গালেনসিস
৩৭। ব্রাহ্মনি কাইট	: হ্যালিএসটার ইনডাস
৩৮। ব্লু রক পিজিয়ান	: কলমবা লিভিয়া
৩৯। স্পটেড ডাভ	: স্ট্রেপটোপিলিয়া চাইনেনসিস
৪০। রিং ডাভ	: স্ট্রেপটোপিলিয়া ডেকাঅকটা
৪১। হোয়াইট ব্রেসটেড ওয়াটার হেন	: অ্যামাওরনিস ফোনিকিউরাস
৪২। ফেজাণ্ট টেলড জ্যাকেনা	: হাইড্রোফ্যাসিয়েনাস চিরুগাস
৪৩। লিটল কারমোরাণ্ট	: ফ্যালাক্রোকোরাক্স নাইগার
৪৪। গ্রে হেরণ	: আরডিয়া চাইনেরিয়া
৪৫। লিটল ইগরেট	: ইগরেটা গারজেটা
৪৬। ক্যাটেল ইগরেট	: বুবুলক্যাস আইবিস
৪৭। পণ্ড হেরণ	: আরডিওলা গ্রেই
৪৮। নাইট হেরণ	: নিকটিকোরাক্স নিকটিকোরাক্স
৪৯। চেসনাট বিটান	: আইক্সব্রাইকাস চিনামোমিয়াস

* আরও অনেক প্রজাতির পাখি ঐ অঞ্চলে নীড় বাঁধতো বা খাদ্যসংগ্রহ ও রাতে আশ্রয় গ্রহণ করতো—যার পরিচয় জানা তখন সম্ভব হয়নি।

পরিশিষ্ট ৯—

মুরগীর ডিমের (১০০ গ্রাম) প্রধান কয়েকটি উপাদান

প্রোটিন	—	১৩·৫০ গ্রাম
ফ্যাট	—	১৩·৬০ গ্রাম
কার্বহাইড্রেট	—	০·৪০ গ্রাম
ক্যালসিয়াম	—	০·০৩ গ্রাম
ফসফোরাস	—	০·১১ গ্রাম
আয়রন	—	১·৫৫ গ্রাম
ভিটামিন 'এ'	—	২০০—৮০০ আই. ইউ
থিয়ামিন	—	৬০—১২০ মিলি গ্রাম
রাইবোফ্লেবিন	—	১০০—৫০০ মিলি গ্রাম
নিয়াসিন	—	৭৬০ মিলি গ্রাম
ভিটামিন 'ডি'	—	১০—৫০ আই. ইউ
ভিটামিন 'কে'	—	অল্প পরিমাণ
ভিটামিন 'ই'	—	অল্প পরিমাণ

পরিশিষ্ট ১০—

ভারতের কয়েকটি বিশিষ্ট গায়ক পাখি

ইংরেজী নাম	বাংলা নাম	হিন্দী নাম
১. কমন আইওরা	ফটিকজল	শৌবীগা
২. ম্যাগপাই রবিন	দোয়েল	ধৈয়াল
৩. শামা	শামা	শামা
৪. গ্রে উইঙ্গড ব্ল্যাক বার্ড	পাহাড়িয়া-মায়াইচা	কস্তুরী
৫. হোয়াইট থ্রোটেড গ্রাউণ্ড থ্রাস	কস্তুরো	মালাগির কস্তুরো
৬. ব্লুহেডেড রক থ্রাস	—	কুযেণ পাত্তি
৭. ব্লুরক থ্রাস	—	পালা টিরিভ

৮.	মালাবার হুইলিং থ্রাস	কস্তুরা	ভাংগরাজ
৯.	টিকেলস রেডক্রেস্টড ব্লু ফ্লাইক্যাচার	ফিরোজা	ফিরোজা
১০.	লার্জ পায়েড ওয়াগটেল	খঞ্জন	মামুলী
১১.	ইণ্ডিয়ান স্কাইলার্ক	ভরত পাখি	ভরত
১২.	কোয়েল	কোকিল	কোয়েল

পরিশিষ্ট ১১—

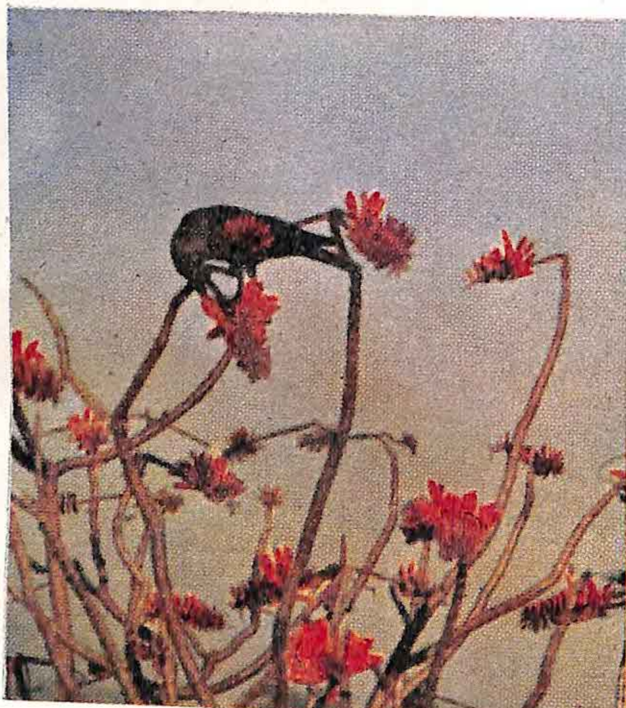
জাতিঙ্গার বহ্নি উৎসবে যোগদানকারী পাখি

১।	ইওলো বির্টান	: আইক্স ব্রাইকাস সাইনেনসিস
২।	মালয়া বির্টান	: গরসাকিয়াস মেলানোলোপস
৩।	ক্যাটেল ইগরেট	: বুবুলকাস আইবিস
৪।	কালিজ ফেজ্যাণ্ট	: লোফিওরা এস পি
৫।	হিল পারট্রিজ	: আরবোরোফাইলা রুফোগুলেরিস
৬।	বেঙ্গল ফ্লোরিক্যান	: ইউপোজেটিস বেঙ্গালেনসিস
৭।	এমারেল্ড ডাভ	: ক্যালকোফাস ইণ্ডিকা
৮।	রেড টারটেল ডাভ	: স্ট্রেপটোপিলিয়া ট্রানকিউবারিকা
৯।	গ্রীন পিজিয়ান	: ট্রেরণ ফেনিকোপটেরা
১০।	ওয়েজড টেলড গ্রীন পিজিয়ন	: ট্রেরণ স্ফেহুরাস
১১।	থিক বিলড গ্রীন পিজিয়ন	: ট্রেরণ কারভিরসট্রা
১২।	ইণ্ডিয়ান রেড ব্রেসটেড প্যারাকিট	: সিটকিউলা আলেক্সএনড্রি
১৩।	ইণ্ডিয়ান কোয়েল	: ইউডাইনেমিস স্কলোপেসিয়া
১৪।	এলপাইন স্থইপ্ট	: আপাস মেলবা
১৫।	কমন কিংফিসার	: এলসিডো আথিস
১৬।	ব্রাউন হেডেড স্টার্কবিল্ড কিংফিসার	: পেলারগপসিন ক্যাপেনসিস
১৭।	ইণ্ডিয়ান থ্রিটোড ফরেষ্ট কিংফিসার	: সিরিক্স এরিথ্যাকাস

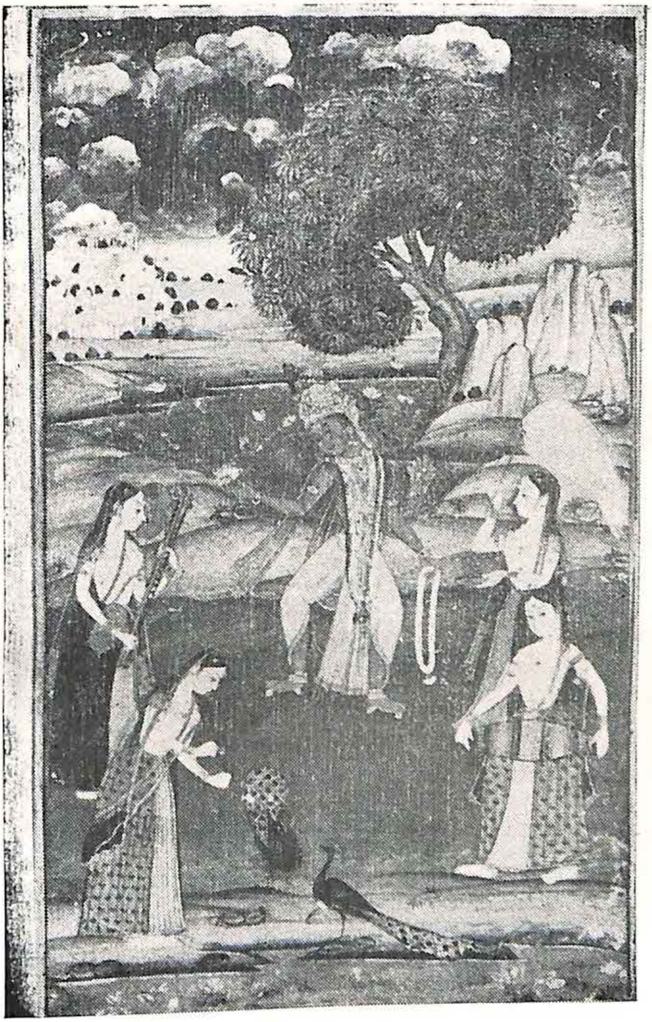
১৮।	ইণ্ডিয়ান রাডি কিংফিসার	: হ্যালসাইয়ন করমানডা
১৯।	মারাঠা উডপেকার	: ডেনড্রকপস মারাঠা এনসিস
২০।	ইণ্ডিয়ান পিট্টা	: পিট্টা ব্রাকাইরাস
২১।	র‍্যাকেট টেলড ড্রঙ্গো	: ডিক্রুরাস প্যারাডাইসিয়াস
২২।	হোয়াইট বেলিড ড্রঙ্গো	: ডিক্রুরাস কেরুলেসেন্স
২৩।	রেড হুইসকার্ড বুলবুল	: পিকনোটাস জ্যাকোসাস
২৪।	নেকলেস লাফিং থ্রাস	: গারুলাক্স মনিলিজিরাস
২৫।	ইণ্ডিয়ান ওয়াটার রেল	: র‍্যালাস এ্যাকোয়াটিকাস



বিলুপ্তির সীমানায় দাঁড়িয়ে—ক্রিমসন ট্রাগোপ্যান



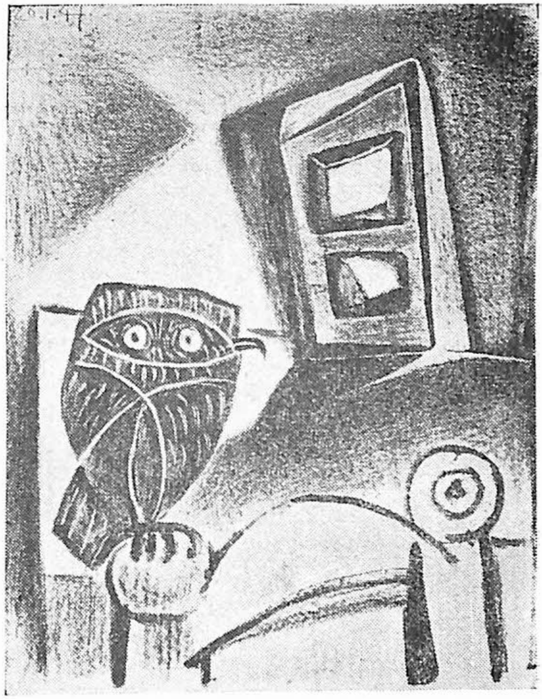
পুষ্প মধু অন্বেষণে কাক



রাগরূপ—মেঘমল্লার



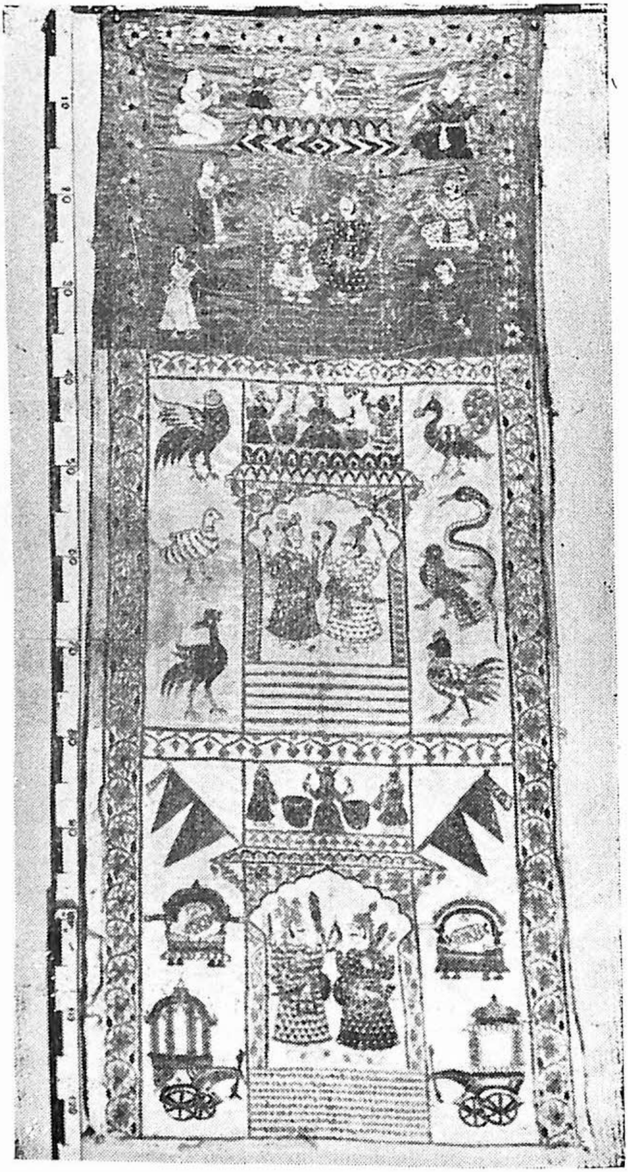
রাগরূপ—মধুমালতি



পিকাসো— পেঁচা



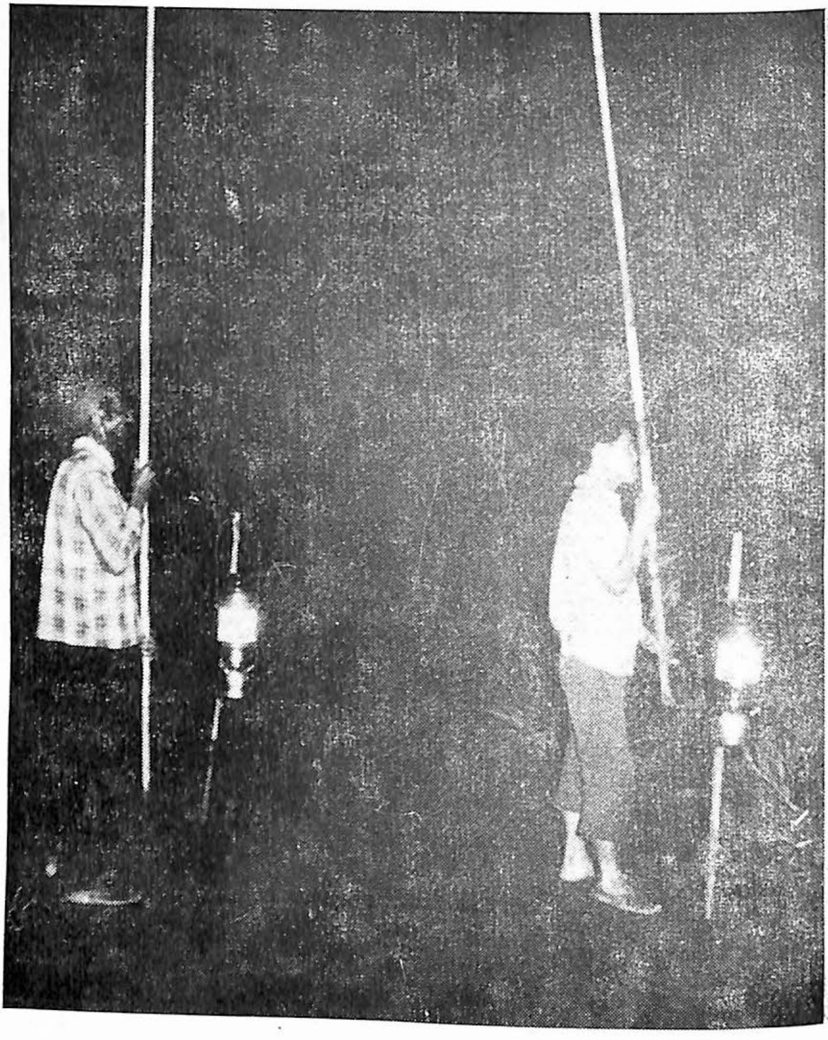
হাঁস— মিশরের পরিচ্ছদে



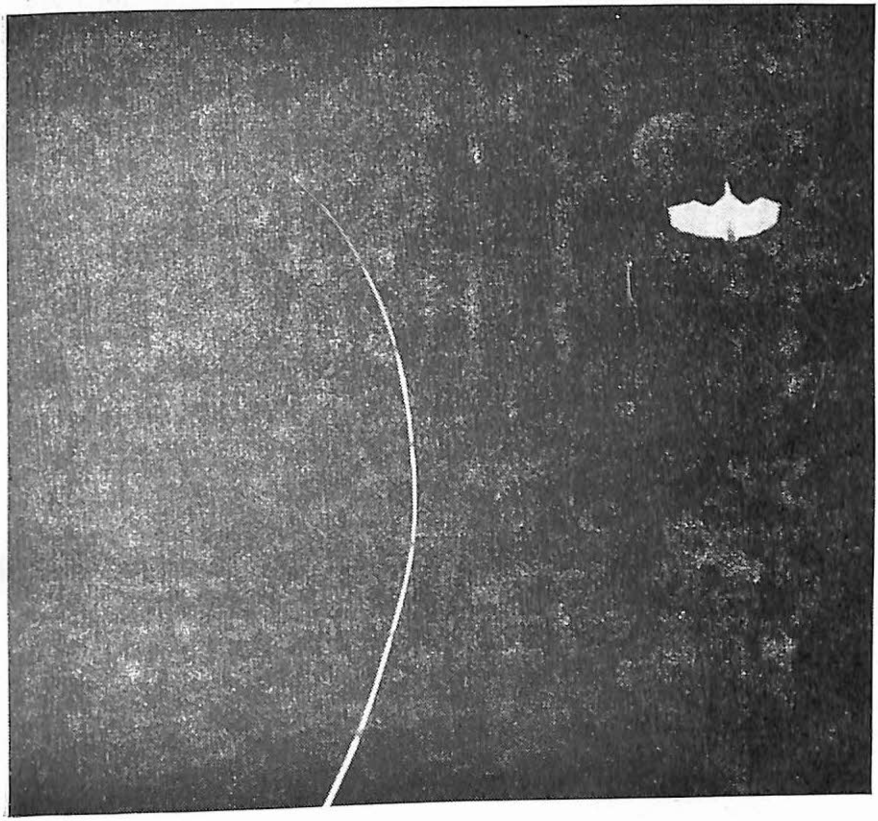
দেওয়াল পর্দায় পাখির রূপব্যঞ্জনা



জাতিঙ্গা



পাখির অপেক্ষায়



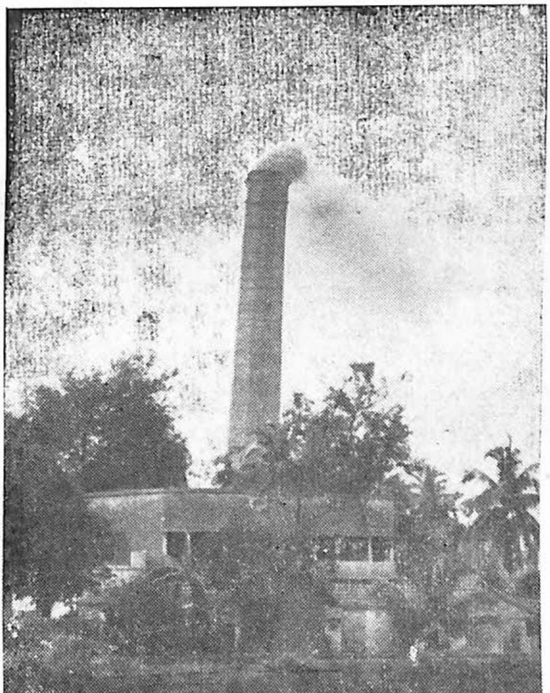
ঐ আসে পাখি



কুঞ্জবিহারী



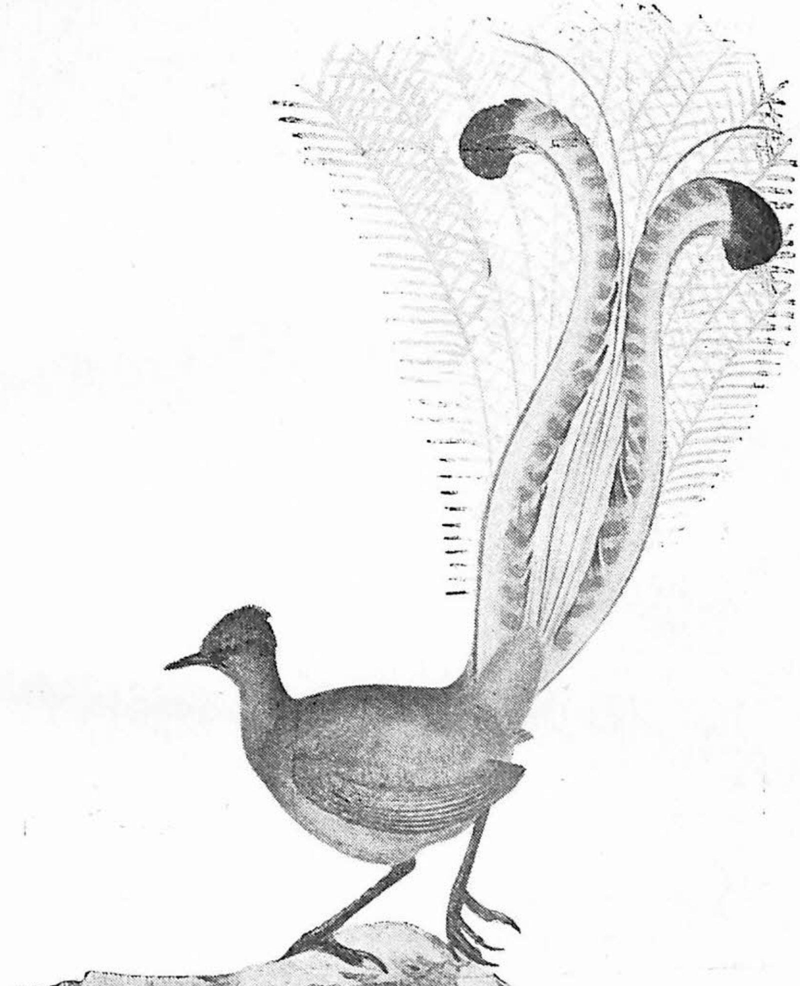
পতঙ্গভূক পিপিট পাখি



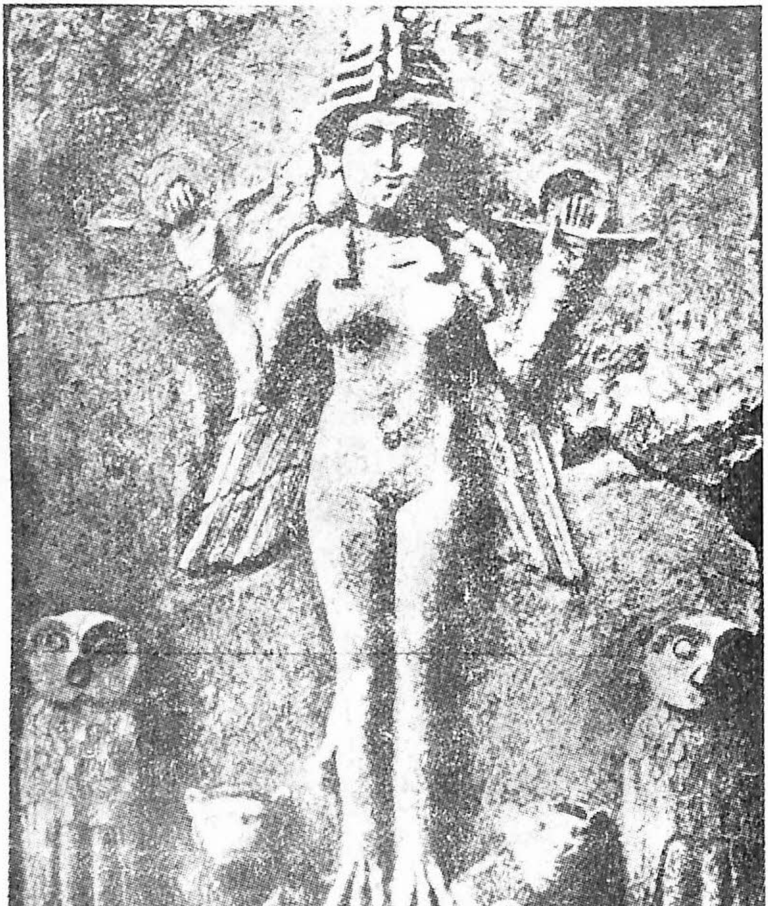
পরিবেশ দূষণ



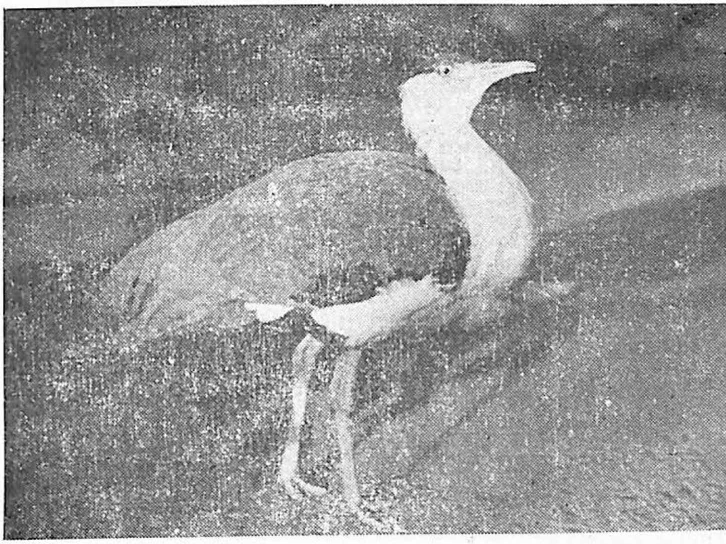
শস্যভুক পায়রা



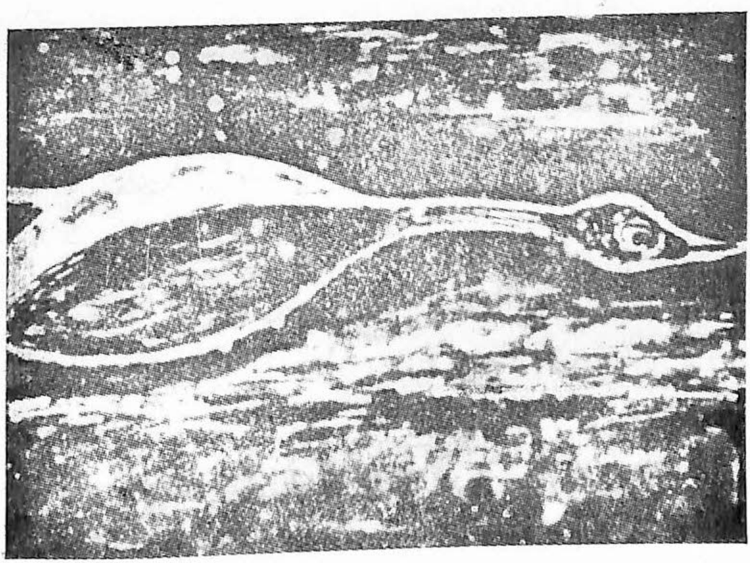
নৃত্যরত লয়ার পাখি



লিলিথ ও পেঁচা



ঘর ছেড়ে দুরান্তে—বাস্টার্ড



হে হংস বলাকা, শিল্পী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



জাহাঙ্গীর ও নীলশির হাঁস



ময়ূর-আরোহী কার্তিক



হংস বাহিনী দেবী সরস্বতী

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ প্রকাশিত ও প্রকাশিতব্য অন্যান্য বিজ্ঞান পুস্তিকা

১। রোগ ও প্রতিষেধ / সুখময় ভট্টাচার্য / ৫'০০
২। পেশাগত ব্যাধি / শ্রীকুমার রায় / ৭'০০
৩। আমাদের দৃষ্টিতে গণিত / প্রদীপকুমার মজুমদার / ৭'০০
৪। শক্তি ঃ বিভিন্ন উৎস / অমিতাভ রায় / ৭'০০
৫। মানুষের মন / অরুণকুমার রায়চৌধুরী / ৪'০০
৬। বয়ঃসন্ধি / বাসুদেব দত্তচৌধুরী / ৯'০০
৭। ভূতাত্ত্বিকের চোখে বিশ্বপ্রকৃতি / সংকর্ষণ রায় / ৮'০০
৮। হাঁপানি রোগ / মনীশচন্দ্র প্রধান / ৪'০০
৯। পশুপাখীর আচার ব্যবহার / জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায় / ৮'০০
১০। ময়লা জল পরিশোধন ও পুনর্ব্যবহার/ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ / ৬'০০
১১। গ্রাম পুনর্গঠনে প্রযুক্তি / দুর্গা বসু / ১০'০০
১২। একশো তিনটি মৌলিক পদার্থ/কানাইলাল মুখোপাধ্যায়/১০'০০
১৩। পরিবর্তী প্রবাহ / ডঃ সমীরকুমার ঘোষ / ৭'০০
১৪। বাস্তব সংখ্যা ও সংহীততত্ত্ব / প্রদীপকুমার মজুমদার / ১০'০০
১৫। অতিশৈত্যের কথা / দিলীপকুমার চক্রবর্তী / ৭'০০
১৬। এফিড বা জাবপোকা / মনোজরঞ্জন ঘোষ /১২'০০
১৭। সয়াবীন / দিবজেন গুহবক্সী / ৯'০০
১৮। জৈবসার ও কৃষিবিজ্ঞানে জীবাণুর অবদান / শ্যামল বণিক
১৯। পাতালের ঐশ্বর্য / সংকর্ষণ রায় / ১০'০০
২০। নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্র / সুশীল ঘোষ / ১২'০০
২১। ঘরে করো শিল্প গড়ো / তিলক বন্দ্যোপাধ্যায় / ১১'০০

চৌদ্দ টাকা